আদায়ের ইতিহাস প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এক

বৈশাখ মাসে ত্রিষ্টুপের জন্ম হয়েছিল। ছাব্বিশ বছর পরে বৈশাখ মাসেই একদিন তার খেয়াল হইল, এ পর্যন্ত জীবনে সে পাওয়ার মতো কিছুই পায় নাই।

সে দিনটা তার জন্মদিন নয়। জীবনের সর্বপ্রথম কান্না সে কোন মাসে কাঁদিয়াছিল, এটা তার জানা ছিল বটে ; কিন্তু তারিখের কোনো হিসাব ছিল না। হিসাব থাকিলে জন্মদিনে মানুষ জন্মমৃত্যুর দুর্বোধ্য রহস্যের কথা হয়তো একটু ভাবে, মনের এলোমেলো খাপছাড়া দার্শনিকতার কষ্টিপাথরে জীবনের দাম কষিবার সাময়িক ইচ্ছাও হয়তো একটু জাগে। ও সব সমস্যা নিয়া ত্রিষ্টুপ আজ মাথা ঘামাইতে বসে নাই। সাধারণ হিসাবে এমন কিছু ঘটেও নাই যে, মনটা তার খারাপ হইয়া যাইবে এবং মনে হইবে এ জগতে সবই ফাঁকি আর জীবনটা তার একদম ফাঁকা। আসলে সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া তখন সে সবে বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে।

তবে রাত্রে সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিল। বড়োই খাপছাড়া অদ্ভুত স্বপ্ন। তার ছেলেটি যেন মরিয়া গিয়াছে। ছেলের শোকে সে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব টিটকারি দিয়া তাকে বলিতেছে, তার মতো মানুষের কি ছেলের জন্য শোক করা উচিত। স্বপ্নে সে অবশ্য সকলের মনের ভাবটা চমৎকার বুঝিতে পারিয়াছিল। ছেলের শোকে পাছে সে পাগল হইয়া যায় অথবা সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় সকলে তার শোককে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ভান করিতেছিল।

উদ্দেশ্য খুব ভালো সন্দেহ নাই। স্বপ্নে সে কারও উপর রাগ করে নাই, শুধু একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া শোকের প্রকাশটা আরও জোরালো করিয়া তুলিয়াছিল। কেমন করিয়া সকলকে সে বুঝাইয়া দিবে যে, তারা ভুল করিতেছে, এ ভাবে তার শোক শান্ত করা যাইবে না ; সকলে তার সঙ্গে একটু কাঁদিলেই বরং তার ব্যথা জুড়াইয়া যাইবে, ভাবিয়া স্বপ্নে বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। ঘুম ভাঙিবার পর সকলের উপর সে একটা তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করিতেছে। স্বপ্ন মিলাইয়াই গিয়াছে স্বপ্নে, এখন শুধু আছে একটা বেদনামাখা বিস্ময়কর ভার-বোধ এবং সকলের নির্মমতার বিরুদ্ধে অভিমান-ভরা নালিশ।

ছেলে তার নাই। এ পর্যন্ত বিবাহ সে করে নাই। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া তার হাসি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নের কথা সে ভাবিতেছে না, স্বপ্নের প্রভাবটা শুধু তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

তার কেউ নাই। সকলে তার পর। তার কিছু নাই। কেউ তাকে কিছু দেয় নাই।

সংসারের কলরব কানে আসিতেছিল। তাকে বাদ দিয়াই সকলে কলরব করিতেছে। স্বপ্নের মতো সে যদি এখন শূন্যে মিশাইয়া যায়, কারও কিছু আসিয়া যাইবে না, এমনই ভাবে কলরব করিয়া চলিবে দিনের পর দিন। এ যে ছেলেমানুষি চিন্তা, ত্রিষ্টুপ তা বুঝতে পারিতেছিল, কিন্তু উপায় কী ! চিন্তাগুলি আজ যেন স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, এতদিনের ধরাবাঁধা পথে শিক্ষিত সৈন্যের মতো সংস্কারগত নির্দেশের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে রাজি নয়। এই ধরনের আরও কত চিন্তা কোথা হইতে আসিয়া তার মনে খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সংযত করিবার কোনো চেষ্টাই কাজে আসিল না।

সাত বছরের একটি মেয়ে দরজার ফাঁকে ডাক দিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, বারোটা পর্যন্ত ঘুমাবে না কি মামা, বিছানা ছেড়ে উঠবে না ?

এদিকে শোন, রাণু।

রাণু নির্ভয়ে কাছে আসিল। মামা তাকে বড়ো ভালোবাসে। হয়তো কাল রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে তার জন্যে কিছু কিনিয়া আনিয়াছে, নয় তো তাকে একটু আদর করিবার শখ জাগিয়াছে মামার। মুখে প্রত্যাশার হাসি ফুটাইয়া রাণু কাছে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র ত্রিষ্টুপ সজোরে তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল !

ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে, না ?

এ তো আদর নয়, রাগের ভানে খেলার ছলে শাসন করা নয়। চমক ভাঙিয়া আঘাতের বেদনায় চিৎকার করিয়া কাঁদিতে রাণুর একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে বিছানা হইতে নামিয়া ত্রিষ্টুপ গটগট করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

একটি ছোটো দোতলা বাড়ির একতলায় তাহাদের অধিকার। ত্রিষ্টুপ ঘুমায় বৈঠকখানায়। দিনের বেলা তার বিছানা ভিতরে টানিয়া আনা হয়, রাত্রে আবার বৈঠকখানায় চৌকিতে বিছানাটি পাতিয়া দেওয়া হয়। ঘরটিতে দোতলার ভাড়াটেদের ভাগ আছে ; দিনের বেলা ত্রিষ্টুপ একা ঘরটি দখল করিয়া থাকিলে তারা আপত্তি করে। সারাদিন একটি লোকও তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে কিনা সন্দেহ, তবু তারা সব সময়ে কোনো এক অজানা আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে এবং কেউ আসিয়া পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে দিনের বেলা ত্রিষ্টুপের বিছানাটি চৌকির উপর গুটাইয়া রাখিতেও দেয় না।

উঠানের এক কোণে তার দিদি প্রভা টিউবওয়েলে জল তুলিয়া বড়ো একটা বালতি ভরিতেছিল, ত্রিষ্টুপকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, রাণু কাঁদছে কেন রে ?

ত্রিষ্টুপ গম্ভীর মুখে বলিল, মেরেছি।

কেন, কী করেছিল মেয়েটা ? কৌতূহলের বশেই প্রভা কথা জিজ্ঞাসা করিল, অনুযোগের জন্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া ত্রিষ্টুপ যেন খেপিয়া গেল।

অত কৈফিয়তে তোমার দরকার ? খুশি হয়েছে—মেরেছি।

প্রভা খানিকক্ষণ অবাক হইয়া ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া রান্নাঘরে গিয়াই দাবি জানাইল, আমার চা কই ?

মা খুন্তি দিয়া তরকারি নাড়িতেছিলেন, বলিলেন, এই যে করে দি। এত বেলা করে উঠলি, চা-ই বা খাবি কখন, চান করে খেতেই বা বসবি কখন ? ওঁর সঙ্গেই তো যেতে হবে তোকে ?

না।

তোর বুঝি দেরিতে আফিস ? তা হোক, ওঁর সঙ্গেই তুই যা বাবা, প্রথম দিনটা। তিনি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবেন।

আমি চাকরি করব না।

কথা শুনিয়া মা হাতের খুন্তি উঁচু করিয়া ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের অনেক চেষ্টার পর পঁচাত্তর টাকা বেতনের এই চাকরিটি জুটিয়াছে, আজ তার ছেলের প্রথম চাকরিতে যোগ দিবার কথা, এখন সে বলিতেছে চাকরি করিবে না। প্রথমটা মা একেবারে থতোমতো খাইয়া গেলেন। তারপর মনে করিলেন তাই কি কখনও হয় ! ছেলে তার সঙ্গে দুষ্টামি করিতেছে।

নে, খুব হয়েছে, আর ফাজলামি করে না। প্রভাকে ডাক তো, তোকে খেতে দিয়ে চাটা করুক।

গামছা কাঁধে ত্রিষ্টুপের বাবা অবিনাশ তেলের খোঁজে রান্নাঘরে আসিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এখন আর চা খেতে হবে না, চান করে ফ্যাল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে, নটা পাঁচিশের গাড়িটা ধরতেই হবে। আজ ফিরবার সময় মাস্থলিটা করে ফেলিস কিন্তু, ভুলিস না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, আমি যাব না বাবা।

যাবি না ? যাবি না মানে ?

চাকরি করা আমার পোষাবে না।

অবিনাশ তেলের বাটি হইতে হাতের তালুতে তেল ঢালিতেছিলেন, খানিকটা তেল মাটিতে পড়িয়া গেল। মার হাতের খুন্তি আবার কড়াইয়ের অনেকখানি উঁচুতে নিশ্চল হইয়া রহিল।

প্রথম কথা কহিলেন অবিনাশ।—কী বলছিস তুই পাগলের মতো ?

এমন সময় রাণুর হাত ধরিয়া প্রভা সেখানে আসিল। রাণুর গালে ত্রিষ্টুপের আঙুলের দাগ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, ঠিক স্বপ্নে ত্রিষ্টুপের ছেলের শোকে কাঁদার মতো। প্রভার মুখ মেঘে ঢাকা আকাশেব মতো অন্ধকার। মেয়ের গালটি সকলের সামনে ধরিয়া সে বলিল, দ্যাখো বাবা, কেমন করে মেরেছে মেয়েটাকে। বেলা হয়ে গেছে, আজ আবার আপিস যাবে, আমি তাই মেয়েটাকে বলেছিলাম তোর মামাকে ডেকে দে তো রাণু। ও গিয়ে যেই ডেকেছে, অমনি মেরে একেবারে খুন করে দিয়েছে। ওর কী দোষটা ? তোমরাই বলো ওর দোষটা কী ? বিশেষ দুটি খেতে-পরতে দিচ্ছ বলে—প্রভা নিজেও ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রভার নালিশ ও কান্না সকলের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ বিচলিত কেউ হয় না। সারাদিনে অন্তত একবার প্রভার নালিশ ও কান্না না শুনিলেই বরং সকলে একটু আশ্চর্য হইয়া ভাবে, কী হইয়াছে প্রভার আজ ? তবে এক হিসাবে প্রভার মন খুব উদার, একটি ধমকেই সে সন্তুষ্ট হয়, কান্না থামিয়া যায়, ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান কবে না। কেবল ধমকটা দিতে হয় কতকটা এই ভাবে : চুপ কর প্রভা, কী বকছিস তুই পাগলের মতো ? তুই কি পর এসেছিস এ বাড়িতে, কুটুম এসেছিস ?

আজ কেউ ধমক দিল না, কিছুই বলিল না। প্রভা আশ্চর্য হইয়া সকলেব মুখেব দিকে চাহিতে লাগিল। তার মেয়ের গালে চড় মারার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বুঝিতে পারা মাত্র কৌতূহলের বন্যায় অভিমান ভাসিয়া গেল।

কী হয়েছে মা ?

হয়েছে আমার অদেষ্ট, আমার পোড়াকপাল !

কী হইয়াছে বুঝা গেল না বটে, কিন্তু ভযানক কিছু যে সত্যই হইয়াছে, সে বিষযে আর সন্দেহ রহিল না প্রভাব। ধৈর্য ধরিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল। জলভরা চোখের সে দৃষ্টি কামিনী বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না, বলিলেন, তিষ্টু চাকরি করবে না বলছে।

ও, এই ! তিষ্টু ফাজলামি করছে।

প্রভার স্বামী রমেশের* আজ চাকরি নাই তিন বছর, প্রভা ভাবিতেও পারে না মানুষ চাকরি পাইয়াও বলিতে পারে, সে চাকরি কবিবে না।

বাপের সঙ্গে এ ধরনের ফাজলামি করা ত্রিষ্টুপের স্বভাব নয়, তবু অথই জলে পড়িলে মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়াইয়া ধরে, অবিনাশ ও কামিনীও তেমনি প্রভার কথা শুনিয়া উৎসুকদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। আশ্চর্য কী, সকলকে একটু চমক দেওয়ার জন্য ত্রিষ্টুপ হয়তো ফাজলামিই করিতেছে। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল না, সে তখন অবাক হইয়া খোলা দরজা দিয়া ওদিকের রোয়াকে একটা তুচ্ছ ঘটনা লক্ষ করিতেছিল। রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া রমেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া রমেশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।

* উপন্যাসে পূর্ববর্তী পাঠে নাম ছিল মিহির। কিন্তু পববর্তী বহুস্থানে মিহিবেব বদলে লেখক বমেশ নাম বাবহাব কবেছেন বলে নামটি বর্তমান পাঠে সংশোধিত হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলী

আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে রমেশের এমন অবস্থা হইয়াছে ? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। রমেশকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দুজনের অবস্থা কী দাঁড়াইবে কে জানে ?

অবিনাশ আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না, একবার একটু কাশিয়া বলিলেন, তাহলে চানটান করে—

দাঁড়াও, আসছি।

ত্রিষ্টুপ একেবারে বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল, গলির মোড়ে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী করা উচিত আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ভাবিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না। দ্বিধা ও সন্দেহে সমস্ত চিন্তা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। মা ও বাবার জন্য, প্রভা ও রমেশের জন্য কিছুদিন চাকরি সে করিতে পারে, কিন্তু কেন করিবে ? নিজের বিশ্বাস, আদর্শ আর নবলব্ধ প্রেরণা বলি দিয়া লাভ কী হইবে ? এক ঘন্টার মধ্যে প্রথম বাধার কাছেই যদি সে হার মানে, অত বড়ো প্রতিজ্ঞা করার কী দরকার ছিল ? মন যার এমন দুর্বল, তার অত বাহাদুরি করা কেন নিজের কাছে ? খানিক আগে যে স্থির করিয়াছে সে চাকরি করিবে না, পৃথিবী রসাতলে গেলেও করিবে না, এত শিগগির তাকে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছে—চাকরি করিবে কী না, আর একবার ভাবিয়া দেখিবার জন্য ! সে যে সত্যই অপদার্থ, এর চেয়ে তার বড়ো প্রমাণ আর কী আছে ?

কিছুদিনের জন্য— ? নিজের মনেই ত্রিষ্টুপ সংশয়ভরে মাথা নাড়ে। কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা বদলাইবে না, বরং সে আরও জড়াইয়া পড়িবে। আজ চাকরি আরম্ভ না করা যত কঠিন মনে হইতেছে, কিছুদিন পরে চাকরি ছাড়া তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

তবে আর একটা কথা আছে। চাকরি না করিলেই বা এখন সে কী করিবে ? বড়ো একটা আদর্শ সামনে খাড়া রাখিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া দিন কাটাইলে তো আর চলিবে না। নিজের জীবনকে সব দিক দিয়া সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করিয়াছে, মানুষ হিসাবে তার যা প্রাপ্য সব সে আদায় করিয়া ছাড়িবে, জগৎকে বুঝাইয়া দিবে তার কাছে আর ফাঁকি চলিবে না ; কিন্তু সে সম্ভব করিবার জন্য সকলের আগে একটা উপায় তো তার খুঁজিয়া বাহির করা চাই ? ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় স্থির করার সময় অবশ্য সে পায় নাই, কিন্তু সময় পাওয়ার পরেও যদি সে স্থির করিতে না পারে ? যে পথে চলিলে নীচে নামিতে হইবে না, পিছন হটিতে হইবে না, আগাইতে আগাইতে সার্থকতায় পৌঁছিতে পারিবে, সে পথ যদি খুঁজিয়া না পায় ? পথ খুঁজিয়া পাইলেও পথ ধরিয়া চলিবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে ?

গভীর বিষাদ অনুভব করিতে করিতে নিজেকে তার বড়ো একা আর অসহায় মনে হয়। আর নিজের মতো জগতের প্রত্যেক মানুষকে একা মনে হয় বলিয়া নিজের অখণ্ড ও অবর্জনীয় একাকীত্বের বোঝা যেন দুঃসহ হইয়া উঠে। কত লোক চলিতেছে পথ দিয়া, কত চিন্তার ঢেউ উঠিতেছে প্রত্যেকের মনে, কিন্তু কেউ কারও চিন্তার খবর রাখে না। কত কাছাকাছি সকলের দেহগুলি, তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি দেহের সঙ্গে আর একটি দেহের কতবার ঠেকাঠেকি হইতেছে, কিন্তু একজনের জগৎ কি এতটুকু কাছে আসিতেছে আর একজনের জগতের ? এমন একটি মানুষও যদি থাকিত—যে তার আপন, যার সঙ্গে তার প্রকৃত যোগাযোগ আছে, হাসিকান্না ছাড়াই যে বুঝিতে পারে সে সুখী কি দুঃখী, এখন তাকে সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিত তার কী করা উচিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে ত্রিষ্টুপের মনে পড়িয়া গেল, সকালে সে চা খায় নাই, রীতিমতো অস্বস্তিবোধ হইতেছে ; ডাইনে বিধুর চায়ের দোকান—স্বাধীন ভারত রেস্টুরেন্ট। এক কাপ চা খাইতে

খাইতে আর একবার চাকরির কথাটা ভাবিয়া দেখা যায়। তক্তার মতো চ্যাপটা বিধুর করাতের মতো দাঁতালো অমায়িক হাসির জবাবে একটু হাসিয়া, দেওয়ালে জরিপাড় শাড়ি পরা জগদ্ধাত্রীর ছবির পাশে পাকা ফলের মতো টসটসে ও গোলাকার উলঙ্গ জাপানি মেয়ের ছবির দিকে আনমনে চাহিয়া চুমুক দিতে দিতে চায়ের কাপ খালি হইয়া গেল, এলোমেলো ভাবনাগুলিকে কোনোমতেই আয়ত্ত করা গেল না।

কলেজ স্কোয়ারে সস্তায় পাওয়া যায়, তিষ্টু।

মণীশ কাছে আসিয়া বসিয়াছে, আলগোছে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়া আড়চোখে চাহিয়া আছে। জুতা আর চুলে চকচকে পালিশ, পাঞ্জাবির হাতা গিলা করা, তলায় গেঞ্জি দেখা যায়, সোনার বোতামগুলি সাদা শূন্যতার মধ্যে টুকরো টুকরো সোনালি অলংকারের মতো।

কী পাওয়া যায় ?

চীন জাপানের মেয়ে—এ দেশিও পাওয়া যায়। কষ্ট করে এখানে না এসে কয়েকটা কিনে এনে ঘরে টাঙিয়ে রাখিস, সারাদিন যত খুশি দেখতে পারবি।

মনে মনে বিরক্ত হইলেও, ত্রিষ্টুপ একটু হাসিল।

তবে একটা বিয়ে করলে, অবশ্য সব হাঙ্গামা চুকে যায়। তাই কর না ?

এই ধরনের পরিহাস করিতে মণীশ খুব পটু। বোধ হয় সেই জন্যই মণীশকে সে পছন্দ করে না। মানুষটা মণীশ খারাপ নয় ; সাজসজ্জার দিকে তার অতিরিক্ত ঝোঁকটা ভালো না লাগিলেও, সেটা ত্রিষ্টুপ অপরাধ মনে করে না। মণীশের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, পড়াশোনাও সে অনেক করিয়াছে, ত্রিষ্টুপ বুঝিয়া উঠিতে পারে না সব সময়ে সে কেন এমন বাবু সাজিয়া থাকিতে ভালোবাসে। ত্রিষ্টুপের সবচেয়ে খারাপ লাগে, মণীশের অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় আর সবজান্তার ভাব। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না, সমস্তই তার কাছে যেন তুচ্ছ। রাজপুত্রের বেশে এই নোংরা চায়ের দোকানে চা খাইতে আসিয়া এখানকার সাধারণ মানুষগুলির সঙ্গে সমানভাবে হাসিগল্প করা আর ছেঁড়া জামা গায়ে চৌরঙ্গীর বড়ো সাহেবি হোটেলে খানা খাইতে গিয়া বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যেন তার কাছে সমান। মাঝে মাঝে সে এখানে আসে, বিনা চেষ্টাতে সকলের সঙ্গে মিশ খাইয়া যায়, তবু যেন একটা দূরত্ব ও ব্যবধান কোনো সময়েই ঘোচে না। ঠিক অহংকার নয়, মানুষগুলিকে অবজ্ঞা করা নয়, কেমন একটা নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ করিয়া চলা.....প্রতিবেশীর নিন্দায়, গুজবের সৃষ্টিতে, ঘরের ব্যাপারের সঙ্গে মিশাইয়া পৃথিবীর রাজনীতির আলোচনায়, তর্কে আর কলহ-বিবাদে সকলে যখন মশগুল হইয়া যায় ; মণীশ তাহাতে যোগ দিতে কসুর না করিলেও, ত্রিষ্টুপের মনে হয় সকলের ছেলেমানুষিতে সে তলে তলে নিছক আমোদ উপভোগ করিতেছে।

দুদিন আগে বিকেলবেলা পরিতোষ আসিয়াছিল, শোকে মুহ্যমান পরিতোষ। একটি চেয়ারও খালি ছিল না, সকলের আগে নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মণীশ তাহাকে বসিতে দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। মুখ দেখিয়া বরং মনে হইয়াছিল, সে বুঝি ভাবিতেছে অনেক দূরে নৌকাডুবিতে একটি পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে, এখানে একটা মানুষ আধমরা হইয়া যায় কেন !

ভালো লাগে না, কিন্তু মণীশকে তুচ্ছও সে করিতে পারে না। সময়ে সময়ে ত্রিষ্টুপের মনে হয়, আসলে এটা তার ভালো না লাগা মোটেই নয়, আর দশজনের মতো মানুষের সুখদুঃখ মানুষটাকে বিচলিত করে না বলিয়া তার অভিমান হইয়াছে, তার প্রতিকারহীন অভিমানের জ্বালাকে মনে হইতেছে বিরাগ।

মনটা ভালো নেই, মণীশদা।

মন ভালো নেই ? সে কী কথা ! মন খারাপ করেছ কেন ?

আমি করিনি। ব্যাপারটা শুনুন—

মণীশ শুনিয়া যায় আর শুনিতে শুনিতে তার মুখ গম্ভীর হওয়ার বদলে যেমন ছিল তেমনই থাকে, হাসি হাসি ভাবটুকু পর্যন্ত মিলাইয়া যায় না। দেখিয়া ত্রিষ্টুপের ভালো-না-লাগা অথবা অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে।

কথা শেষ করিয়া ঝাঁঝালো সুরে সে তাই জিজ্ঞাসা করিল, হাসবার কী হল ?

মণীশ বলিল, হাসিনি। চাকরি করতে চাও না বলছ, বড়ো কিছু করতে চাও। কী করবে সেটা এখনও ঠিক করনি। তা যতদিন সেটা ঠিক করতে পারছ না, ততদিন চাকরিটা করলে হত না ? কিছু পয়সা জমাতে পারলে বড়ো কিছু আরম্ভ করতে একটু সুবিধা হবে।

কিছুদিন চাকরি করলে যদি—

ও ভাবে যদির কথা ভাবলে কিছু হয় না তিষ্টু। প্ল্যান করবার সময়ে সমস্ত যদির হিসাব ধরতে হয়—যদি এ রকম হয়, তবে এই ব্যবস্থা করতে হবে, যদি ও রকম হয়, তবে ও রকম ব্যবস্থা করতে হবে ; ব্যস, সেইখানে যদির শেষ। যদি এ রকম না হয়ে ও রকম হয়, ভেবে প্রথমেই ভড়কালে তো চলে না ! তাছাড়া, কিছুদিন চাকরি করে, সময়মতো চাকরিটা ছাড়বার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে, তাতেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে—বড়ো কিছু করবার ক্ষমতা তোমার নেই। চাকরি করে যাওয়াটাই তখন সব চেয়ে ভালো হবে তোমার পক্ষে।

কিন্তু চাকরি করলেই জড়িয়ে পড়ব যে ! বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে চাকরি নেওয়ার মানেই দাঁড়াবে—

বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে চাকরি নেবে কেন ? নিজের জন্য চাকরি নেবে, বড়ো কিছু করবার অঙ্গ হিসাবে চাকরি নেবে। কী করব, এখনও ঠিক করতে পারিনি, চাকরি করে যা পারি উপার্জন করা যাক—এই ভেবে চাকরি নেবে। বাড়ির লোকের মুখ চেয়ে বড়ো কিছু করা যায় না, তিষ্টু। সাক্সেসের জন্য স্বার্থপর না হলে চলে না। অবশ্য বাড়ির লোকের মুখ কেন, পৃথিবীর লোকের মুখ চাইতে কোনো বারণ নেই, সকলকে বঞ্চিত করে নিজের সুখ খোঁজার স্বার্থপরতার কথা বলছি না—সাক্সেসের পথে বিঘ্ন হিসাবে যা কিছু দাঁড়াবে, সে সমস্ত বিসর্জন দেওয়ার কথা বলছি। যেমন ধর—তুমি যেদিন চাকরিটা ছেড়ে দেবে, বাড়ির লোক সেদিন কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলবে, তুমিও তাদের সঙ্গে কাঁদবে, অন্তত মনে মনে কাঁদবে। কিন্তু ভাববে, কাঁদুক, উপায় কী !

সাড়ে দশটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বাড়ি ফিরিল। অবিনাশ রান্নাঘরের দরজার কাছে মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, তখন পর্যন্ত তিনি স্নানও করেন নাই।

আপিস যাওনি যে ?

লজ্জা করে না তোর ? জোয়ানমদ্দ তুই ঘরে বসে থাকবি, বুড়ো বয়সে আমি খেটে খেটে মরব ? তুই যদি না যাস, আমিও আর যাব না।

চলো, চলো আমি যাচ্ছি।—এক খাবলা তেল নিয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে ত্রিষ্টুপ তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বড়োবাবু পদ্মলোচন অভিমান করিয়া বলিলেন, প্রথম দিনটাতেই দেরি হল !

অবিনাশ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, মন্দিরে একবার পুজো দিতে গিয়ে—

পদ্মলোচন তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, তা বেশ, তা বেশ।

ত্রিষ্টুপ অবাক হইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। একজন অনায়াসে মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিল ; পূজা দিতে গিয়া আপিস পৌঁছিতে দেরি করার জন্য বিরক্ত হইলে পাছে অপরাধ হয়, এই ভয়ে আর একজনের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে উপিয়া গেল। দুজন সমবয়সি নিরীহ গোবেচারি মানুষ, জীবনটাও

হয়তো দুজনের একই ছাঁচে ঢালা—পরীক্ষা পাস, চাকরি ও সংসার—কিন্তু একজন মন্দিরের নামে মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না, আর একজন মন্দিরের নাম শুনিলেই ভড়কাইয়া যায়।

আপিস ত্রিষ্টুপের অপরিচিত নয়, আগে মাঝে মাঝে দরকার পড়িলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ; চাকরি হওয়ার সময়ে বিনা দরকারেই ঘনঘন অনেকবার আসিয়াছে। অনেকের সঙ্গেই তার চেনা ছিল, অবিনাশ আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—প্রত্যেকের ভদ্রতা ও শুভ কামনার জবাবে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, আপনার দয়া।

বাড়ি ফিরিবার সময়ে ট্রামে ও ট্রেনে অবিনাশ ছেলেকে অনেক রকম উপদেশ দিলেন, আপিসে কোন লোকটা ভালো আর কোন লোকটা বজ্জাত মুখে মুখেই তার লম্বা তালিকা শুনাইয়া দিলেন ; কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করিতে হইবে তাও বুঝাইয়া দিলেন।

—আস্তে আস্তে ডিপ্লোমেসি শিখতে হবে, নইলে উন্নতির কোনো আশা নেই বাপু। দেরি করার জন্য পদ্মলোচন চটে ছিল, দেখলি তো কেমন সামলে নিলাম ?—অবিনাশ সগর্বে ছেলের মুখের দিকে তাকাইলেন –অন্য কেউ হলে কেঁউ কেঁউ করত, আর ও ব্যাটা আবও চটে যেত, আমি তো জানি কত ধানে কত চাল, এমন কৈফিয়ত দিলাম যে আব টুঁ শব্দটি করতে পারল না !—একটু থামিয়া উপসংহার করিলেন, তবে লোকটা সত্যি ধার্মিক। মন্দির দেখলেই আধঘণ্টা ধরে প্রণাম করে।

ত্রিষ্টুপ বলিল, আর প্রার্থনা করে, আমার মাইনে বাড়ুক ?

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, সে তো সবাই করে !

বিধুর চায়ের দোকানে মণীশ বসিয়াছিল। সূর্য চোখেব আড়ালে চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এত আগে মণীশ কখনও বিধুর চায়ের দোকানে আসে না।

ত্রিষ্টুপ বলিল, তুমি এগোও বাবা, আমি আসছি।

চায়ের দোকানে ঢুকিতে যাইতেছে দেখিয়া অবিনাশ শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, খালি পেটে চা খেয়ো না তিষ্টু।

ত্রিষ্টুপ মাথা নাড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণীশ জিজ্ঞাসা কবিল, কেমন লাগল তিষ্টু ?

ত্রিষ্টুপ বলিল, কেমন যেন লাগল, মণীশদা।

কেমন লাগল বুঝতে পারছ না ? তার মানে ভালোও লাগেনি, খারাপও লাগেনি।

সব যেন কেমন খাপছাড়া মনে হল।

মণীশ মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, বোসো, চা খাও।

ত্রিষ্টুপ দ্বিধাভরে বলিল, খালি পেটে—

মণীশ হাসিল, পেট খালি থাকবে কেন ? চপ খাও, কাটলেট খাও, টোস্ট খাও,—বাড়ির খাবার না হলে কী তোমাব পেট ভরে না ?

মণীশের কাছে চিরদিন নিজেকে ত্রিষ্টুপের ছেলেমানুষ মনে হয়, আজ আরও বেশি মনে হতে লাগিল। একটু শ্রান্তিও সে বোধ করিতেছিল, শারীরিক নয়, মানসিক শ্রান্তি।

সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তবু সকালবেলার লড়াইয়ের জের যেন এখনও মেটে নাই, কেবলই মনে হইতেছে, সে যেন সন্ধি করিয়াছে হার মানার ভয়ে। কেমন একটা অনির্দিষ্টভাবে নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছে।

থাক, দোকানের খাবার খেতে হবে না তিষ্টু। আমার বাড়িতে কিছু খাবে চলো।

আপনার বাড়িতে মণীশদা ? খাবারটাবার করার হাঙ্গামা—

হাঙ্গামা আর কীসের ? খাবার তৈবি হয়েই আছে, চাটা শুধু করতে হবে।

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইল। এসো।

মণীশের বাড়ি বেশি দূরে নয়, দু-চারবার ত্রিষ্টুপ তার বাড়িতে গিয়াছে। আগে কোনোদিন মণীশ তাকে ভিতরে ডাকে নাই, আজ একেবারে দোতলায় তার নিজের ঘরে নিয়া গেল।

বোসো তিষ্টু।

একটা রং-চটা কাঠের চেয়ারে বসিয়া ত্রিষ্টুপ বিস্ময়ের সঙ্গে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এ ঘর যে মণীশের, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না। যার মাথায় একটি চুল সে কোনোদিন স্থানভ্রষ্ট দেখে নাই, তার ঘরে এমন বিশৃঙ্খলা, এমন দারিদ্র্যের ছাপ।

টেবিলে আর টেবিলের নীচে বই গাদা করা, এক কোনায় জমা করা কতকগুলি ইংবাজি বাংলা সাময়িক পত্রে ধুলা জমিয়া আছে, ট্রাঙ্ক ও সুটকেসটির রং বিবর্ণ, অনেক দিনের পুরানো খাটের বিছানার চাদরটি ময়লা। নূতন সোফা-টেবিলে জমকালো বাহিরেব ঘব পার হইয়া বাড়ির ভিতরেব গরিবানা, অপরিচ্ছন্ন চেহারা দেখিযাই ত্রিষ্টুপ একটু অবাক হইযা গিয়াছিল, মণীশেব নিজেব ঘব দেখিয়া সে একেবারে থ বনিয়া গেল।

তাকে বসিতে বলিয়াই মণীশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। একটু পবেই সে ফিরিযা আসিল। আরও খানিকক্ষণ পরে দুহাতে দুটি থালায় লুচি আর তরকাবি নিয়া একটি মেয়ে ঘরে আসিল।

মেয়েটিকে ত্রিষ্টুপ কলতলায় বাসন মাজিতে দেখিয়াছিল।

দুই

মণীশের বোনের নাম কুন্তলা। বিবাহ-দেওয়া-দরকারের বয়স হইযাছে—দু-একবছর বেশিই হইযাছে। এই বয়সে সময় হিসাবে দু-একবছর যে কত দীর্ঘ আর অ-তুচ্ছ কে তা না জানে ? দাদা যে ত্রিষ্টুপকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়াছে কেন সেটুকু বুঝিবার মতো আর বুঝিযা যে জোবালো লজ্জা সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিতে চায়, সেটা জোর করিয়া লুকাইযা রাখাব চেষ্টা করার মতো জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কুন্তলার জন্মিয়াছে।

প্রথমটা তাই ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, মেয়েটা বুঝি একটু পাকা। তারপব দু-চাবদিনেই এ ভুল ধারণা তার ঘুচিয়া গিয়াছে। কুন্তলার চালচলন কথাবার্তায় যেটুকু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়িয়াছিল, এখনও কিছু কিছু ধবা পড়ে, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এই বয়সের দেওয়াল-চাপা ভীবু মেয়ের পক্ষে ওটুকু অস্বাভাবিকতাই স্বাভাবিক। তৃতীয়বার কুন্তলা যখন খাবারের থালা হাতে সামনে আসিযা দাঁড়াইয়াছিল, তখন ত্রিষ্টুপের খেয়াল হইয়াছিল যে বেচারি জানে, তাকে পছন্দ করাইতে পারিলে সে তাকে বিবাহ করিলেও করিতে পারে ! পঞ্চমবার মণীশের বাড়িতে গেলে কুন্তলা যখন চলনসই কাঁপা গলায় রবিবাবুর একটি গান শুনাইয়াছিল তখন ত্রিষ্টুপের আরেকটা বিষয় খেয়াল হইয়াছিল ; তার মন ভুলানোর চেষ্টার মতো কিছু পাছে বলিয়া বা করিয়া বসে এই ভয়ে কুন্তলা বড়োই কাবু হইয়া আছে।

ত্রিষ্টুপ মমতা বোধ করে। ভাবে যে মণীশের বাড়িতে আর আসিবে না। এ ভাবে মেয়েটাকে পীড়ন করা, তার মনে মিথ্যা আশা জাগিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। কেবল কুন্তলা নয়, মণীশও তো অনেক কিছু আশা করিতেছে। তাকেও এ আশা পোষণ করিয়া চলিতে দেওয়া অন্যায় হইবে বইকী।

আগে হইতে যদি মণীশের বাড়িতে তার যাতায়াত থাকিতে, তবে কোনো কথা ছিল না। চাকরি হওয়ার পর তার কাছে বোনকে গছানোর ইচ্ছা মণীশের জাগিয়াছে টের পাইয়াও ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা বজায় রাখা দোষের হইত না। কিন্তু চাকরি আরম্ভ করার দিন তাকে বাড়িতে ডাকিয়া

1754

নিয়া গিয়া কুন্তলার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার মধ্যে মণীশ তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট রাখে নাই। জানিয়া শুনিয়া এখন ঘনঘন মণীশের বাড়ি যাওয়া চলে না।

কিন্তু দু দিন যাওয়া বন্ধ রাখিয়াই ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, কাজটা সহজ নয়। সন্ধ্যার পর মণীশের ছোটো ভাই ক্ষিতীশ আসিল। কুন্তলা নয়, মণীশের মা নিজে পিঠা তৈরি করিয়াছেন, এখনও ত্রিষ্টুপ যায় নাই কেন ? অবিলম্বে ক্ষিতীশের সঙ্গেই সে যেন গিয়া হাজির হয়।

ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে, চলুন শিগগির।

ত্রিষ্টুপের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল।

ক্ষিতু, তোমাকে কে বলল ছোড়দি হাঁ করে বসে আছে ?

ক্ষিতীশ একটু ভড়কাইয়া গেল, বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া ত্রিষ্টুপের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, আমি দেখে এলাম যে ?

ও তুমি দেখে আসছ। দাদা বলতে বলেনি, না ?

ক্ষিতীশ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, দাদা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

কেন ?

ক্ষিতীশের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়োরা কী বোকার মতো কথা বলে !

পিঠে খাবার জন্য। ছোড়দি কী বলে জানেন ? আপনি শুধু পিঠে খেতে পারেন, আর আমি পারি। দুটো-তিনটের বেশি খেলেই দাদার অসুখ করে।

এতক্ষণে ত্রিষ্টুপের গাম্ভীর্য কাটিয়া গেল। মনে মনে সে রীতিমতো লজ্জাই বোধ করিতে লাগিল। পছন্দ হইলে কুন্তলাকে সে বিবাহ করিতে পারে ভাবিয়া বোনের সঙ্গে তার মেলামেশার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তাকে গাঁথিবার জন্য চালবাজি আরম্ভ করিয়া ব্যাপারটাকে কুৎসিত করিয়া তুলিবার মানুষ মণীশ নয়। তাব নিজের মনটাই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে ; হয়তো পরনেব ছেঁড়া ময়লা শাড়িখানি বদলাইয়া একখানি ফরসা শাড়ি পরিয়াছে—সস্তা সাধারণ শাড়ি, পাছে সে মনে করে যে তার জন্যই সাজগোজ। একবাব ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে যাওয়াটা কমাইয়া আনাই কি ভালো নয় ? দুদিন যায় নাই, আজ যখন ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কী আসিয়া যাইবে ? আবার চার-পাঁচদিন একেবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না, আজ না যাওয়াই ভালো। যাওয়ার ইচ্ছাটা তার নিজেরই আজ বড়ো বেশি জোরালো হইয়া উঠিয়াছে, যাওয়ামাত্র সকলে তার আগ্রহ টের পাইয়া যাইবে। কাল পরশু বরং দশ মিনিটের জন্য গিয়া দেখা করিয়া আসিবে, কতকটা ভদ্রতা রক্ষার জন্য দেখা করার মতো। আজ নয়।

আমার শরীর তো আজ ভালো নেই ক্ষিতু, কী করে যাব ?

অসুখ করেছে ?

হ্যাঁ, অসুখ করেছে।

ক্ষিতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলে ত্রিষ্টুপ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মিথ্যা অজুহাতে ক্ষিতীশকে ফিরাইয়া দিবার জন্য নয়, যায় নাই বলিয়া কুন্তলা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়াও নয়, মণীশের বাড়ির আকর্ষণ অনুভব করিয়া। এত অল্প সময়ের মধ্যেই কুন্তলা যদি তার মনকে টানিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে, নিজের সম্বন্ধে তবে আর আশা ভরসা করিবার কিছু নাই।

আধঘণ্টা পরে মণীশ আসিল।

কী হয়েছে তিষ্টু ?

এমনি শরীরটা একটু—

বিশেষ কিছু নয় তো ? তবে এসো—দুটো-একটা পিঠে তোমায় খেতেই হবে ভাই। কাল থেকে আয়োজন করে পিঠে তৈরি হয়েছে, তুমি চেখে দেখে সার্টিফিকেট না দিলে কেউ খুশি হবে না।

সুতরাং ত্রিষ্টুপ গেল। আগের দিন শহরের অন্য প্রান্ত হইতে স্বামী ও দুটি মেয়েকে নিয়া কুন্তলার দিদি বাপের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে। পিঠার আয়োজনটা হইয়াছে ওদের জনাই, ত্রিষ্টুপের জন্য নয়।

কুন্তলার দিদি রমলাকে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল। কুন্তলার চেয়ে সে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড়ো, সাত বছর আগে তার বিবাহ হইয়াছে এবং মেয়ে হইয়াছে দুটি ; তবু প্রথমবার তার দিকে তাকাইয়া ত্রিষ্টুপের মনে হইয়াছিল, কুন্তলাই বুঝি শাড়ি গয়না পরিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বউ সাজিয়াছে। যমজ না হইয়াও যে দুটি বোনের চেহারায় এত মিল থাকিতে পারে, ত্রিষ্টুপ কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

কেবল বাহিরের নয়, দুজনের ভিতরের মিলটাও যে বিস্ময়কর, প্রথমে ত্রিষ্টুপের কাছে তা ধরা পড়ে নাই। কুন্তলা ভীরু লাজুক নম্র ; রমলা হাসিখুশি, মিশুক, কথা বলিতে পটু। সাত বছরের বিবাহিত জীবন অধিকাংশ মেয়েকেই ভোঁতা করিয়া দেয়, রমলার বেলা ফলটা হইয়াছে যেন ঠিক তার উলটা। তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ হইয়াছে, জীবনীশক্তি বাড়িয়াছে, আনন্দ আহরণের ক্ষমতা বাড়িয়াছে। স্ফূর্তি আর উৎসাহের জন্য যেন বিশেষ উপলক্ষ দরকার হয় না ; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে উৎসবের প্রেরণা যেন সঞ্চিত আছে, চয়ন করিয়া নিলেই হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে দুজনের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও মিলটা ত্রিষ্টুপের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, কুন্তলার সঙ্গে রমলার শুধু বিকাশের পার্থক্য—কিশোরীর সঙ্গে যুবতির। যে কথায় কুন্তলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিতেছে, সেই কথাতেই রমলা হাসিয়া উঠিতেছে উচ্ছ্বসিতভাবে, যে মমতায় কুন্তলা কচি মেয়েটাকে কোলে নিয়া সন্তর্পণে তার গালে চুমা দিয়া বলিতেছে, কেঁদো না, সেই মমতাতেই রমলা বড়ো মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া দলিয়া মলিয়া তাকে বুকের সঙ্গে যেন মিশাইয়া দিতে চাহিয়া বলিতেছে, কাঁদে না জাদু, মামাবাড়ি এসে কি কাঁদতে আছে রে দুষ্টু পাজি সোনা ?

যে সুখদুঃখের হিসাব কুন্তলা ভবিষ্যতের কল্পনায় জমা রাখিয়া ভাবিতেছে, কে জানে আমার কপালে কী আছে, সেই সুখদুঃখের স্বাদ নিতে নিতে রমলা ভাবিতেছে কে জানে আমার কপালে এত সুখ টিকিবে কি না ! রমলা সত্যসত্যই সুখী। কেবল নিজে সে সুখী হয় নাই, আরেক জনকেও সুখী করিয়াছে। রমলার স্বামী ধীরেনের শান্ত, পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ত্রিষ্টুপের হঠাৎ এক সময় মনে হয় জীবনের হিসাব নিকাশের অঙ্কশাস্ত্রটাই কি তবে তার ভুল ? তিরাশি টাকার একজন কেরানি এমন সুখী হইল কী করিয়া ?

তিন

ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে—এটা সে পছন্দ করিতে পারিতেছে না। মানুষকে দেখিয়া কোথায় সে নিজেও সুখী হইবে, তার বদলে মন তার বিরূপ হইয়া পড়িতেছে—তিরাশি টাকার কেরানির জীবনে সুখশান্তির অস্তিত্ব মানিতে সে রাজি নয়। দেখিয়া যা মনে হইতেছে তা সত্য নয়, আসলে এদের দুজনের জীবন দুঃখময়—এ ধারণা সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়।

কদিন এদের কথাই সে ভাবিয়া যায়। চিন্তাধারার প্রতিবাদের মতো, অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমের মতো দুজনে তাকে পীড়ন করিতে থাকে। চারিদি[illegible] [illegible]খিতে পায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো

ছায়া, দেহে ক্ষয়, জীবনে অপচয়, সংকীর্ণ, নিঃস্ব আবেষ্টনীর পেষণ। এই পরিচয়েরই ছাপমারা তাবও বর্তমান। তাই তো সে ভবিষ্যৎ রচনা করিতে চায় ! আজ কিছু নাই, কাল ঐশ্বর্য চাই। এই অবস্থায় ধীরেন ও রমলা আবার কী ধাঁধা সৃষ্টি করিল !

মণীশকে সে জিজ্ঞাসা করে, ধীরেনবাবু বেশ লোক, না ?

হ্যাঁ ও ভালো মানুষ, খাঁটি।

মণীশের কথার মানে তার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল কয়েক দিন পরে। নিজেদের সংসারে ধীরেন ও রমলাকে দেখিয়া আসিবার ইচ্ছাটা সে দমন করিতে পারিতেছিল না। রবিবার বিকালে সে শহরের এক প্রান্তে তাদের ছোটো একতলা বাড়িতে গিয়া হাজির হইল।

আগের দিন প্রথম রাত্রে অসময়ের ঝড় উঠিয়াছিল। ঝড় উঠিলে, ত্রিষ্টুপ গভীর উল্লাস বোধ করে। ঝড়ের বেগে বাড়ির কাছে সিধা তবুণ আমলা গাছটি যত বাঁকা হইয়া যায়, তার বাঁকা মন যেন অনির্বচনীয় পুলকে ততই খাড়া হইয়া ওঠে। এই সতেজ গর্বিত আনন্দ সাপের মতো মনের কোনো অন্ধকার কোণে কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে, সাপুড়িয়ার বাঁশির মতো ঝড়ের সাঁ-সাঁ আওয়াজে ঘুম ভাঙিয়া ফণা উঁচু করে। ঝড় থামিয়া যাওয়ার পবেও এই উত্তেজনার প্রভাব মিলাইয়া যাইতে কয়েক দিন সময় লাগে, ত্রিষ্টুপের অনুভূতি রসে ভিজিয়া সজীব হইয়া থাকে।

ধীরেনের বাড়ির অবস্থানটি ত্রিষ্টুপের ভারী ভালো লাগিল। এ শহরতলি পুরানো, শহরের পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজনে নূতন সৃষ্টি হয় নাই। পুরানো বাড়িগুলি এলোমেলো ভাবে বসানো, রাস্তা আঁকাবাঁকা। আগাছাভরা বাগানের কযেকটি টুকরা এখানে ওখানে বসানো আছে। ধীরেনের বাড়ির অদূরে পানার আস্তরণ বিছানো একটি পুকুর। কাছে ও দূরে অনেক নারিকেল গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তায় ছোটো ছেলেদের মার্বেল খেলায়, বাড়ির সামনে রোয়াকে বসিয়া বড়ো ছেলেদের জটলা করায়, উবু হইয়া বসিয়া এক প্রৌঢ়ের হুঁকা হাতে তামাক খাওয়ায়, ছেলে কোলে এক বাড়ির দুয়ার হইতে বাহির হইয়া একটি আধময়লা শাড়ি পরা তরুণীর আরেক বাড়ির দুয়ারে ঢুকিয়া পড়ায়, তার এখনকার শান্ত মানসিক অবস্থার সঙ্গে কেমন একটা আশ্চর্য সামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে।

বাড়ির ভিতরে গৃহসজ্জার মধ্যেও একটি সর্বাঙ্গীণ সঙ্গতি তার বড়োই তৃপ্তিকর মনে হইল। এ সব সংসাবে বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশি চোখে পড়ে অসঙ্গতি। ভাঙা চৌকির পাশে মস্ত দামি ড্রেসিং টেবিল, পেবেকমারা কাঠের চেয়ারেব পিঠে রঙিন সুতার কাজ করা খোল, দামি ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের পাশে আঠা দিয়া দেয়ালে আঁটা মাসিকের ছবি, ময়লা বিছানার চাদরে ধবধবে পরিষ্কার ওয়াড়-পরানো তেল-চটচটে বালিশ, পিঁড়ির সঙ্গে কার্পেটের আসন, সযত্নে সাজানো জিনিসের একটি তাকের নীচেই অযত্নে ছড়ানো জিনিসের আরেকটি তাক। এ বাড়িব গৃহোপকরণে সেই বিসদৃশ বিরোধ নাই, চারিদিক ছড়ানো একটি বিস্ময়কর সাম্যের ভাব দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।

ত্রিষ্টুপের মনে হয়, এ ঘর যারা সাজাইয়াছে তাদের সত্যই বদ্ধি আছে। অতিরিক্ত ঝকঝকে কিছু তারা চায় নাই বলিয়া একেবারে রংচটা কিছু তাদের রাখিতে হয় নাই। তিনটি ভাঙা চেয়ারের মধ্যে একটি খুব দামি চেয়ারে তাকে বসানোর গৌরব বাতিল করিয়া দিয়াছে বলিয়া চারটি সাধারণ শক্ত চেয়ারের যে কোনো একটিতে তাকে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে বলিতে পারিয়াছে।

ধীরেন ও রমলা যে রকম আগ্রহের সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা জানাইল, ত্রিষ্টুপের বিশ্বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িল যে, তার সবটাই আন্তরিক। তার সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু একদিনের। রমলা একবার শুধু তাকে বলিয়াছিল, সে এ বাড়িতে আসিলে তারা খুশি হইবে। ভদ্রতা করিয়া ও কথা কে না বলে ? ওই আহ্বানেই কেউ বাড়িতে আসিলে, ভদ্রতা করিয়া কে না খুশি হয় ? কিন্তু সে আসায় সত্যই এদের যেন আনন্দের সীমা নাই। তার এই অনুগ্রহে তারা যেন কৃতার্থ হইয়াছে।

রমলা বলিল, আপনি একদিন আসবেন জানতাম।

কী করে জানতেন ?

অনেকে বলে যায়, কিন্তু আসে না। দু-চারমাস পরে দেখা হলে বলে, সময় পাইনি, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম, এবার একদিন নিশ্চয় যাব। আপনি তাদের মতো নন। সেদিন কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম।

ছোটো মেয়েটিকে কোলে করিয়া রমলা বসিয়াছে, বড়ো মেয়েটি চেয়ার ঘেঁষিয়া মার পিঠে এক হাত রাখিয়া শান্ত কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রমলার ভাব দেখিলে সত্যই মনে হয়, ত্রিষ্টুপ আজ ঠিক এই সময়ে আসিবে জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে হইতেই সব কাজ, সব হাঙ্গামা চুকাইয়া রাখিয়াছে। অন্য সমস্ত বিষয়ের চিন্তাও সে এখনকার মতো মনের একপাশে সরাইয়া দিয়াছে, তার সবটুকু মনোযোগ এখন অভ্যাগতের প্রাপ্য। সংসারের কোনো কাজ, কোনো দায়িত্ব যাদের নাই, বাড়িতে কেউ আসিলে তাদেরও ত্রিষ্টুপ এমন স্থির শান্ত একাগ্রভাবে কখনও এক মিনিট আলাপ করিতে দেখে নাই, প্রতি মুহূর্তে রমলা যেন তার আত্মমর্যাদা বাড়াইয়া দিতে থাকে। একজনের প্রথম বাড়িতে আসার অপরিহার্য অস্বস্তি ও সংকোচ আপনা হইতে যেন কোথায় মিলাইয়া যায়।

আজ ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝিতে পারে—অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কীভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে কীভাবে দাম বাড়ে। জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে, ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়ো, যে অবস্থায় জীবনযাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।

রাত প্রায় আটটার সময়ে ত্রিষ্টুপ বিদায় নিল। পথে এবং বাড়ি ফিরিয়া রাত্রে ঘুম আসা পর্যন্ত এই নূতন অভিজ্ঞতাই সে মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। তিরাশি টাকার এক কেরানির জীবন রমলা সুখে ও শান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। অপূর্ণতা তাকে পীড়ন করে না, রমলা তার আত্মগ্লানি জাগিতে দেয় না। দুঃখের ছোঁয়াচ লাগলে রমলা তাতে নিজের আনন্দের প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। এক বিষয়ে হতাশা জাগিলে অনেক বিষয়ে আশা জাগাইয়া রমলা তাকে সঞ্জীবিত করে। যা আছে, তারই সন্তোষে মন ভরিয়া রাখিয়া, বাঁচিবার প্রয়োজনে মাসে মাসে তিরাশি টাকা দানের জন্য দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিয়া দারিদ্র্যের পেষণ ভুলাইয়া রাখে।

মণীশ বলিয়াছিল, ধীরেন ভালোমানুষ, খাঁটি। তাকে কাঁদাইলে সে কাঁদে, হাসাইলে সে হাসে। তাই কি রমলা তার মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিতে পারিয়াছে ? অন্য কোনো মানুষ হইলে পারিত না ?

এই একটা খটকা ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া থাকে। রমলাই যে ধীরেনকে সুখী করিয়াছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেটা যে ধীরেনের ব্যক্তিত্বের অভাবের জন্য সম্ভব হইয়াছে তাও সে বিশ্বাস করিতে পারে না। ধীরেনের পরিচয়ও সে আজ ভালো করিয়া জানিয়া আসিয়াছে। দুর্বল পরনির্ভরশীল হাবাগোবা মানুষ সে নয়। ত্রিষ্টুপের তাই মনে হয় শুধু ধীরেন নয়, যে কোনো মানুষকে রমলা সুখী করিতে পারিত ; বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মানুষ ছাড়া।

তাকেও পারিত।

বিছানায় শুইয়া এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আধাঘুম আধাজাগরণের মধ্যে ত্রিষ্টুপের চিন্তা ও কল্পনা জড়াইয়া যাইতে থাকে। সে যেন দেখিতে পায়—তাকে সুখী করার জন্য কুন্তলা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। যে রকম একটি ছোটো একতলা বাড়িতে রমলা আর ধীরেন বাস করে, অবিকল সেই রকম একটি বাড়িতে ঠিক রমলার মতো সাজ করিয়া কুন্তলা কাঠের চেয়ারে বসিয়া আছে, তার কোলে একটি শিশু, তার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরেকটি মেয়ে।

মণীশের বাড়ি যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিল। ধীরেনের বাড়িতেও আর গেল না। রমলাকে দেখিলে মনে পড়িবে কুন্তলাও তারই মতো। ধীরেনের পরিতৃপ্ত মুখ দেখিতে হইবে, মনে হইবে কুন্তলাকে নিয়া এমনি সুখের সংসার পাতিতে কোনো বাধা নাই। সে সুখশান্তি চায় না। ধীরেনের মতো আনন্দোজ্জ্বল হাসির বিনিময়েও সংকীর্ণ খাঁচায় সে ঢুকিবে না। আর বিচারবিবেচনা নয়, বসিয়া বসিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব নিয়া মাথা ঘামানো নয়। যা সে ঠিক করিয়াছে তাই ঠিক। জগৎ চুলোয় যাক।

মণীশ খোঁজ করিতে বাড়ি আসিল না, ক্ষিতীশও আসিল না। দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল, সেই চায়ের দোকান হইতে মণীশ তাকে ডাকিল।

দোকানে এখন ভিড় জমিয়াছে, একটি চেয়ারও খালি ছিল না। দোকানের ছোকরা কোথা হইতে একটা ভাঁজ করা চেয়ার আনিয়া ছোটো একটু ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

একজন আজ একশো টাকা ঠকিয়েছে, তিষ্টু।

কে ?

তুমি চিনবে না। পাল চৌধুরী কোম্পানির পালবাবু।

চিনি। একবার চাকরির খোঁজে দেখা করেছিলাম।

ওর একশো লাখ টাকা আছে। আমার একশোটা টাকা কী করে আদায় করা যায় বসে বসে ভাবছিলাম।

ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া ত্রিষ্টুপ বলিল, ও টাকার আশা ছেড়ে দিন। ভেবে আর কী করবেন ?

মণীশ মৃদু হাসিল—ভেবে আর কী করব, টাকা আদায় করব।

টাকাব জন্য মণীশকে একটু বিচলিত মনে হয় না। পালবাবু টাকাটা না দেওয়ায় সে যেন খুশি হইয়াছে—আদায়ের জন্য লড়াই করিতে পারিবে। মণীশের প্রকৃতির এই দুর্বল দিকটা ত্রিষ্টুপ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পাওনা আদায়ের জন্য লড়াই করিতে সে যদি ভালোবাসে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য একজনের সঙ্গে শুধু লড়াই না করিয়া অনেক টাকার জন্য অনেকের সঙ্গে লড়াই করে না কেন ? সে কি মনে করে সে যা পায়, তাব বেশি আর কিছু তার পাওনা নাই ? উপার্জন বাড়ানোর জন্য সে তার অসাধারণ শক্তিগুলি কাজে লাগাইতে অবহেলা করে ; কিন্তু কেউ একটি পয়সা ফাঁকি দিলে নির্মম ধৈর্যের সঙ্গে সেই পয়সাটি ছিনাইয়া আনিবার জন্য প্রায় সাধনা শুরু করিয়া দেয়।

কদিন যাওনি কেন, তিষ্টু ?

খুব ব্যস্ত ছিলাম।

মণীশ আর কিছুই বলিল না। তার আগ্রহের অভাবে ত্রিষ্টুপও একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে রাস্তায় নামিয়া হঠাৎ সে বলিল, কুন্তলার যদি বিয়ে দেন—

ত্রিষ্টুপের দুই কান গরম হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মণীশের কাছে কুন্তলার বিবাহ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল বিনা ভূমিকায় এমন ভাবে কথা তুলিবার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না। মণীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কুন্তলার বিয়ে দেবেন না ?

দেব বইকী। বিয়ে না দিলে চলবে কেন ?

আমাদের অফিসে একটি ছেলে আছে তার সঙ্গে চেষ্টা করতে পারেন। নরেশ নাম। ছেলেটি বেশ ভালো ; বাড়ির অবস্থাও মন্দ নয়। আপনি যদি বলেন—

মণীশ হাসিমুখে তার একটি হাত ধরিয়া বলিল, কুন্তলার বিয়ের জন্য ভেবো না, ভাই। যার তার হাতে ওকে দিতে পারব না। আমি ছাড়া ওর জন্য কেউ ছেলে খুঁজে বার করতে পারবে না।

এ ছেলেটি—

খুব ভালো ছেলে। কিন্তু কুন্তলার সঙ্গে ওর যে বনবে তার ঠিক কী ? আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি, তিষ্টু। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো পাত্রটির সঙ্গেও আমি কুন্তলার বিয়ে দেব না। এমন একটি ছেলে খুঁজে আনব, যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে। ছেলের অবস্থা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, চরিত্র কেমন, এ সব দেখার আগে আমি দেখব ছেলের প্রকৃতি কেমন, কুন্তলার সঙ্গে খাপ খাবে কি না।

ত্রিষ্টুপ সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, সেটা দেখা দরকার বটে।

তাড়াতাড়ি কুন্তলার বিবাহ মিটাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচানোর জন্যই সে ভালো একটি ছেলের সন্ধান দিয়াছে, অথচ একটু বিবেচনা পর্যন্ত না করিয়া মণীশ প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া তাকে যেন বাঁচাইয়া দিল। মণীশের কথা শুনিতে শুনিতে যতই তার মনে হইতে লাগিল কুন্তলার উপযুক্ত ছেলে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, ততই যেন মনটা তার হালকা হইয়া যাইতে লাগিল।

মণীশ বলিল, সব চেয়ে বেশি দরকার। অন্তত আমি তাই মনে করি। তোমাদের হিসাবে ধীরেনের চেয়ে হাজার গুণ ভালো একটি ছেলে রমলার জন্য পাওয়া গিয়েছিল—এখন সে মাসে হাজার টাকা রোজগার করে। আমিই জোর করে ধীরেনের সঙ্গে রমলার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালোই করেছিলাম কী বল ?

আচ্ছা মণিদা, বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল ?

মণীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

চার

ঠিক এই অবস্থাতেই ত্রিষ্টুপের দিন কাটিতে লাগিল। জীবনটা মনে হইতে লাগিল একঘেয়ে।

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল, কোনো দিক দিয়া অবস্থার অপ্রত্যাশিত কোনো পরিবর্তন ঘটিল না ; জিভে খারাপ লিভারের স্বাদের মতো ত্রিষ্টুপের মনে জাগিয়া রহিল ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বদ গ্লানি। নিজের আলস্য, অকর্মণ্যতা, অপদার্থতা ও অক্ষমতার জন্য অনুতাপের জ্বালা হইলে তার এতটা কষ্ট হইত না। নিজে সে কিছু করিতেছে না, তা যেন নয়। কিছু করিতে পারিতেছে না, তাও নয়। কিছু হইতেছে না। কোনো এক অজ্ঞাত অকারণে জীবনের কোনো এক অনির্দিষ্ট অনিয়মে, ব্যর্থতা না ঘটিয়াও সার্থকতার অভাবটা স্থায়ী হইয়া যাইতেছে।

আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয় নাই। নষ্ট হইলে বোধ হয় ভালোই হইত—কিছুদিনের জন্য নষ্ট হইলে। আগুনে লোহা পোড়ানোর মতো এ বিপদ ছাড়া মানুষের চলে না। ত্রিষ্টুপ যে জানে একদিন সে সাফল্য লাভ করিবেই করিবে, এই জানাটাই তাকে ঠান্ডা লোহার মতো কঠিন করিয়া রাখিয়াছে, নূতন অবস্থার উপযোগী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চয় করিতে দিতেছে না। আগে নিজেকে নূতন জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ার উপযোগী করিতে না পারিলে, নিজের চেষ্টায় কে নূতন জীবন সৃষ্টি

করিতে পারিয়াছে ? কিছু ঘটিবে না, এ ভয় ত্রিষ্টুপের নাই। কিছু ঘটিতেছে না বলিয়া ভয়ার্ত ব্যাকুলতার বিশ্রী অনুভূতিটাই শুধু সে বোধ করিতেছে, পথ খুঁজিবার তাগিদ পাইতেছে না। এ তো মনের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। রাজকন্যা ও রাজকুমারের মিলনে রূপকথার শেষ জানিয়াও কাহিনির মাঝখানে কুমারের বিপদের পর বিপদ ঘটার সময়ে অসহায় ক্ষোভে কাতর হওয়া চলে। নিজের মনের রূপকথায় নিজের এখনকার দুরবস্থায় ত্রিষ্টুপ অনায়াসে উদ্‌বিগ্ন হইতে পারিয়াছে।

বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা খুঁতখুঁত করে। হাতখরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া বাকি বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই তিনি অনায়াসে ফিরাইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রথমে তার টাকাগুলি তাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরনের তুচ্ছ খুঁতগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।

টাকাপয়সা সম্পর্কে আর একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা ত্রিষ্টুপ সঞ্চয় করিয়াছে। চাকরি পাওয়ার পর রমেশ বার তিনেক তার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। সাহায্য নয়,—ঋণ, পরে শোধ করিবে। শেষবার সে যখন কুড়িটি টাকা ঋণ চাহিল, ত্রিষ্টুপের হাতে একেবারেই টাকা ছিল না।

বাবার কাছ থেকে চেয়ে দিচ্ছি।

বাবার কাছ থেকে ? তা—আমার নাম কোরো না কিন্তু ভাই।

বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন কী জন্য টাকা চাই ?

বোলো তোমার নিজের দরকার। নয় তো বোলো কোনো বন্ধু ধার চেয়েছে। আমার নাম কোরো না, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার হবে।

রমেশের বেকার অবস্থার জন্য ত্রিষ্টুপের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। নিজে সে হাতে পাওয়া চাকরি ছাড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবে, সে বিশ্বাস করিত না যে চেষ্টা করিলে কোনো মানুষের পক্ষে দিন চলার মতো সামান্য উপার্জন কবা অসম্ভব। রমেশের অবস্থার জন্য রমেশকেই সে দায়ি করিয়া রাখিয়াছে। তবু প্রভার স্বামী টাকা যখন চাহিয়াছে, না দিলে চলিবে না। বিরক্তিতে মন ভরিযা অবিনাশের কাছে টাকা চাহিতে গেল।

অবিনাশ বলিলেন, কুড়ি টাকা ? কী করবি কুড়ি টাকা দিয়ে ?

ত্রিষ্টুপ বলিল, দরকার আছে।

মা বলিলেন, অত খরচে হোসনে তিষ্টু।

অবিনাশ বলিলেন, দরকার আছে জানি। কী দরকার আছে শুনি না ?

ত্রিষ্টুপ বলিল, কী দরকার না জানলে টাকা দেবে না ?

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। আহত বিস্ময়ে তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মার হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গেল।

টাকা দেব না বলিনি তো, তিষ্টু। টাকা দিয়ে কী করবি তাই শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম।

ত্রিষ্টুপও তা জানে। অবিনাশের শুধু জিজ্ঞাসা, আর কিছু নয়। কুড়ি টাকার বদলে কুড়ি পয়সা চাহিলেও অবিনাশ এমনই ভাবে জানিতে চাহিতেন পয়সাটা কী কাজে লাগিবে। বাড়ির বাহিরে যাইতে দেখিলে যেমন জিজ্ঞাসা করেন সে কোথায় যাইতেছে, এও তেমনই জিজ্ঞাসা।

তার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত ছোটোবড়ো সব খবরই ওরা রাখিয়াছেন ; প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না এমন কিছু তার জীবনে উপস্থিত হইয়াছে, এ ধারণাই ওদের নাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বুঝতে পারিয়া মনটা ত্রিষ্টুপের বড়ো খারাপ হইয়া গেল। টাকা সে নিক, খরচ সে করুক, সেটা

ভিন্ন কথা। কীসে টাকা খরচ করিবে, এটুকু জানিবার অধিকার তার বাপ-মা দাবি করেন। টাকা যদি সে নষ্ট করিতে চায় তাও সে করুক। কিছু না বলার চেয়ে সে অনেক ভালো। এ গোপনতার মানেই স্পষ্ট ভাষায় তার ঘোষণা করা যে, এতদিন যা করিয়াছ, বেশ করিয়াছ, এখন হইতে আমার সমস্ত বিষয়ে তোমরা মাথা ঘামাইতে আসিও না। শুধু অবিনাশের একটি প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করায় আজ মতের অমিল, অবাধ্যতা আর কলহের চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

হাতে দেওয়ার বদলে টাকাটা ত্রিষ্টুপ রমেশের সামনে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়া নয়, মনে অশ্রদ্ধা থাকিলে, সময় বিশেষে আপনা হইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া যায়।

রমেশ বলিল, শিগগির তোমার টাকা ফিরিয়ে দেব ভাই, এক মাসের মধ্যে। কত যেন হল সবসুদ্ধ ?

টাকাটা ও ভাবে ছুঁড়িয়া দিয়া ত্রিষ্টুপ একটু অনুতাপ বোধ করিয়াছিল, রমেশের অমায়িকতা দিয়া অপমান চাপা দিবার চেষ্টায় আবার তার পিত্ত জ্বলিয়া গেল।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।

তখন উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া চোখ পাকাইয়া রমেশ বলিল, তার মানে ? ও রকম বাঁকা করে কথা বলছ যে ?

বাঁকা করে কী বললাম ?

বুঝি, বুঝি। আমরা ও সব বুঝি। ভাবছ যে ধার বলে নিচ্ছে, তার মানেই তাই। কাজ নেই ভাই তোমার টাকা নিয়ে আমার, বরং কাবলিওয়ালাকে খত লিখে দেব।

দিন সাতেক পরে ত্রিষ্টুপ আপিস হইতে বাড়ি ফেরা মাত্র প্রভা একতাড়া নোট হাতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রিষ্টুপকে দেখাইয়া নোটের তাড়া হইতে পঁচিশ টাকার নোট বাছিয়া সামনে ফেলিয়া দিল।

তোমার টাকা।

সুদ কই ? ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা করিল। এদের বিকৃত অভিমানেব পরিচয় তো সে জানে, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাইল না।

নোটের তাড়াগুলি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে প্রভা নিজেই বলিল, চিরকাল কারও সমান যায় না। দুদিন অবস্থা একটু খারাপ হলে কী রকম যে করে সবাই ! সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যেন ফতুর করে দিল। প্রভার চোখ জলে ভরিয়া যায়, মনে থাকবে সব, কত লাথি, ঝাঁটা, অপমান জুটেছে। এতদিন চুপ করে সব সয়েছি, আর তো চুপ করে থাকব না।

লাথি, ঝাঁটা, অপমান ! চুপচাপ সব সহ্য করা ! হাসিবে না কাঁদিবে, ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল না। সারাদিন প্রভা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিল। বাপ-মাকে কাঁদাইল এবং নিজেও কাঁদিল। সকলকে সে আঘাত করিতে চায় না, প্রমাণ করিতে চায় যে, এতদিন সকলের কাছে তার শুধু অনাদর আর অপমানই জুটিয়াছে। রমেশের চাকরি থাকিলে বাপের বাড়িতে দিন কাটানোর সময়ে সকলের যে কথা ও ব্যবহার তার কাছে সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকিত, রমেশের চাকরি ছিল না বলিয়াই সেই কথা ও ব্যবহারের মধ্যেই এতকাল কত কিছু আবিষ্কার করিয়া সে অভিমান করিয়াছে। নিজের এই বিকারকে সে সমর্থন করিতে চায়। সেই চেষ্টায় একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া দিয়া সে রমেশের সঙ্গে চলিয়া গেল।

রওনা হওয়ার আগে রমেশ অবিনাশকে বলিল, আপনার খুব টাকার টানাটানি চলছে শুনছিলাম ?

অবিনাশ বলিলেন, কই না ? চলে যাচ্ছে এক রকম ! তিষ্টুর চাকরিটা হয়ে—

আমি কিছু টাকা দিলে কি আপনার অপমান হবে ? আমি তো আপনার ছেলের মতো।

অবিনাশের মনে ছিল না ; কিন্তু ত্রিষ্টুপের এখন মনে পড়িয়া গেল, রমেশ টাকা ধার চাহিতে আসিলে, তিনি টাকা ধার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ধার দিতে পারব না, বাবা। ধার চাওয়াটাও তোমার উচিত হয়নি। তুমি এমনি টাকা নাও। আমার কাছে টাকা নিতে তোমার অপমান কী ? তুমি তো আমার ছেলের মতো। ছেলের মতো বলিয়া তাকে ধার দেওয়ার বদলে একেবারে দান করিতে চাওয়ায় রমেশের রাগ হইয়াছিল। এতদিন সেই রাগ মনে পুষিয়া রাখিয়াছে, আজ সেই ঝাল মিটাইতে চায়।

ত্রিষ্টুপের যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। এক বিষয়ে এত তীক্ষ্ণ মান-অপমান জ্ঞান, এত তেজ, অথচ সবটাই বিকার। কতগুলি বিষয়ে মানুষটা সুস্থ ও স্বাভাবিক, আবার কতকগুলি বিষয়ে এমন খাপছাড়া বলিবার নয়। বেকার জীবন কি এমনই সব মানসিক রোগের সৃষ্টি করে ?

অবিনাশ আনন্দ ও আবেগে রমেশের হাত চাপিয়া ধরিলেন। —না বাবা, অপমান কীসের ! এখন তো দরকার নেই, দরকার থাকলে তোমার কাছ থেকে নিতাম বইকী। নিজে চেয়ে নিতাম।

খোঁচাটা বিঁধিল না দেখিয়া রমেশ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই চলিয়া গেল।

কোথায় কী কাজ সে পাইয়াছে, এত টাকা হঠাৎ সে কোথা হইতে পাইল, এ সব স্পষ্ট করিয়া কিছুই তার কাছে জানা গেল না। প্রশ্ন করিয়া পাওয়া গেল শুধু ভাসাভাসা জবাব। ঠিক চাকরি নয়, এজেন্সির মতো কী যেন তার একটা জুটিয়াছে।

ত্রিষ্টুপের মনে আঘাত লাগিল বইকী ! স্বামীর ধার করা পঁচিশটা টাকা তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া এভা তাকে যেভাবে আঘাত করিতে চাহিয়াছিল সে ভাবে নয়। রমেশের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনটাই তাকে যেন ঝাঁকি দিয়া গেল। রমেশ অপদার্থ, জীবনে কোনোদিন তার অভাব ঘুচিবে না, এই ছিল মানুষটা সম্বন্ধে তার ধারণা। কেবল পরিবর্তন নয়, নিজের অবস্থায় খুব ভালো রকম পরিবর্তনই সেই রমেশ করিয়াছে। তার কাছে মনে হইতেছে আকস্মিক, কিন্তু এ উন্নতি হয়তো রমেশের অনেক দিনের চেষ্টার ফল।

স্বামীর সঙ্গে বিদায় হইয়া যাওয়ার তিন-চারদিন পরেই প্রভা একবার এ বাড়িতে আসিয়াছিল, যাওয়ার দিন যে কাণ্ড করিয়া গিয়াছিল সে জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে।

কদিনের মধ্যে গায়ে গয়না চাপানোর সুযোগ সে পায় নাই, তবে নূতন যে কাপড়খানা পরিয়া আসিয়াছে তার দাম অনেক। তাকে পৌঁছিয়া দিতে গেল ত্রিষ্টুপ। প্রভাই একরকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। রমেশ একটি সুশ্রী নূতন বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটা আসবাব কিনিয়াছে দামি দামি। এতদিনের পুরানো জিনিসপত্রের গায়ে আঁটা দারিদ্র্যের পরিচয়ের মধ্যে স্বচ্ছলতার আরও অনেক চিহ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভার কপাল ফিরিয়াছে ভাবিয়া এক দিকে ত্রিষ্টুপের বুকটা যেমন হালকা হইয়া গেল,—অন্য দিকে রমেশের মতো মানুষ যা পাবিয়াছে নিজে সে তার চেষ্টা পর্যন্ত শুরু করিতে পারিল না ভাবিয়া মন তার ভারী হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, তার দ্বারা বোধ হয় কিছু হইবে না। সে শুধু কল্পনা করিতে জানে, তার শুধু স্বপ্ন দেখা। নিজে যে অক্ষম, অপদার্থ। নিজের সম্বন্ধে ধারণাটাই শুধু তার বড়ো।

আত্মবিশ্বাসে আগুন লাগার তাপে পুড়িতে পুড়িতে তার দিন কাটিতেছিল ; এক সপ্তাহ পরে রমেশকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল এবং প্রভা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল বাপের বাড়ি। ত্রিষ্টুপের মনে হইল, একটা চোখে যেন এতদিন তার দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ সেই পুরাতন অন্ধ চোখে নূতন দৃষ্টি আসিয়াছে।

পাঁচ

প্রথম কিছুদিন আপিসের কাজ কবিতে ত্রিষ্টুপের ভালোই লাগিল। জীবনে এ তার একটা নূতন অভিজ্ঞতা—অনেকের সঙ্গে কলম পিষিয়া পয়সা উপার্জন করা। নূতন সাথি, নূতন আবেষ্টনী। প্রথম কয়েক দিন সে ঘাড় গুঁজিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটানা কাজ করিয়া যাইত, মনোযোগের ছোটো ছোটো বিরামগুলিতে এই ভাবিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিত, সে কাজ করিতেছে, কাজ ! তার ছোটো ঘরখানাতে বিছানায় চিত হইয়া দেশবিদেশের চিন্তাবিদদের ছাপানো মতামতের চিন্তায় মগজ বোঝাই করার ছলে অমন বেকার জীবনযাপন করার বদলে, নিজের চিন্তা ও কল্পনার জাল বোনার বদলে কিছু একটা কাজ করিতেছে। গৃহের অসুস্থ মন তার যেন আপিসে চেঞ্জে আসিয়াছে। এ যেন প্রায় মুক্তির সমান।

প্রকাণ্ড একটা টেবিল ঘিরিয়া দশজন কর্মী বসে ; তাদের মধ্যে সে স্থান পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে আরও অনেকগুলি ছোটো ছোটো টেবিলে আরও অনেক সহকর্মী আছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ চারিদিকে তাকায়। ঘরের সোঁদাগন্ধি গরম বাতাসের ঘনত্ব যেন অনুভব করা যায়, দুটি ফ্যান পাক খাইতে খাইতে অবিরাম এলোমেলো আলোড়ন বজায় না রাখিলে বাতাস যেন আরও গাঢ় হইয়া জমিয়া যাইত। দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া বসানো প্রায় ছাতের সমান উঁচু কাঠের তাকগুলিতে গাদা করা কাগজপত্র—কত মানুষের কত দিনকার কত পরিশ্রমের ফল কে জানে !

আপিসের কয়েক জনের সঙ্গে ত্রিষ্টুপের একটু একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে।

মুগ্ধবোধ নকল করছেন নাকি মুগ্ধ হয়ে ?

ত্রিষ্টুপ মুখ তুলিয়া একটু হাসে। টেবিলের অপর দিকে তার মুখোমুখি বসে সত্যেন। বয়স ত্রিষ্টুপের চেয়ে বেশি নয়—অভিজ্ঞতা বেশি। বছর তিনেক কাজ করিতেছে। একমাথা কোঁকড়া চুলে তার সাধারণ চেহারাটিকে একটু অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ত্রিষ্টুপের মনে হয়—তার চুলগুলি হঠাৎ ও রকম অসাধারণ হইয়া গেলে লজ্জায় সে কারও কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

হুঁ হুঁ বাবা, মোহমুদ্গরের গুঁতো তো লাগেনি, টের পাবেন !

ডান পাশের নিকুঞ্জ। বেঁটে, মোটা, মাঝবয়সি, ধীর স্থির মানুষ, ছোটো ছোটো চোখ দুটি কেবল সর্বদা পিটপিট করে। সে নাকি নতুন বিবাহ করিয়াছে, দ্বিতীয়বার। আধময়লা জামাকাপড় পরিয়াই কিন্তু সে আপিসে আসে, কেবল তেলে ভেজা চুলে সযত্নে টেরিকাটা আর কামানো মুখে স্নো-পাউডার লাগানো ছাড়া তার আর কোনো বাহার নাই। মাথার সুগন্ধি তেলের গন্ধটা সর্বদাই ত্রিষ্টুপের নাকে লাগে।

অত স্পিডে কাজ করবেন না মশায়, মারা যাবেন শেষে। যত শিগগির শেষ করে দেবেন, তত কাজ ঘাড়ে চাপাবে। একদম খই পাবেন না।

টাইপিস্ট ধীরেন। একটি ফুলস্ক্যাপ শিটে কয়েক লাইন টাইপ করিয়া টাইপরাইটার যন্ত্রের চাবিগুলিতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে চাবিগুলিতে বিদ্যুদ্বেগে তার আঙুলের সঞ্চালন ত্রিষ্টুপ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু ধীরেন একটানা আঙুল চালায় না, মিনিট দুই-তিন টাইপ করিয়া আট-দশমিনিট বসিয়া থাকে, গল্প করে আর ইয়ার্কি দেয়। মাঝে মাঝে দশ-বিশমিনিট দ্রুত একটানা টাইপ করিয়া হাতের কাজ শেষ করিয়া, কাগজগুলি ঘণ্টাখানেক ফেলিয়া রাখে, তারপর ধীরে সুস্থে কর্তাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়। মন্থর গতিতে সে টাইপ করিতে পারে না, আঙুল বাগ মানে না।

তিন মাসেব মধ্যে আপিস একঘেযে হইয়া উঠিল।

এমনিভাবে এক একটি বৈশিষ্ট্যেব মধ্যে নতুন নতুন মানুষেব পবিচয পাইযা, অবস্থাব সঙ্গে খাপ খাওযানোব জন্য তাদেব সকবুণ অন্তহীন লডাই দেখিযা, নিজেব জীবনে বৈচিত্র্য আসাব আনন্দ ও উৎসাহ ত্রিষ্টুপ অনুভব কবিতে লাগিল। বডো কিছু না হোক, এ ছোটো কাজই বা মন্দ কী ? এ কাজেও তো মানুষ মশগুল হইযা যাইতে পাবে।

প্রথম ত্রিষ্টুপেব কাছে ধবা পডিল—কাজ সহজ, অতি সহজ। মনোযোগ দেওযা অসম্ভব। তাবপব ধবা পডিল—এই সহজ কাজ কবিতে তাব সময লাগে দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত, কোনো কোনো দিন তাব চেযেও বেশি। স্কুলেব ছেলে অনাযাসে যা পাবে, সেই কাজ কবিতে তাব এত সময খবচ হয।

বাহিবে আকাশ ছাওযা মেঘেব বর্ষণ চলিযাছে, দিন দুপুবে ঘবে জ্বালা হইযাছে আলো। পাখা বন্ধ, হালকা ঠান্ডা বাতাসে সোঁদা গন্ধটা ভিজা ভিজা মনে হয। ঘবেব সকলেব মুখে মুখে ত্রিষ্টুপ চোখ বুলায—বন্দীত্বেব অনুভূতি তাকে যে কষ্ট দিতেছে কাবও মুখে কি তাব একটু ছাযা সে দেখিতে পাইবে না ? কুডি পঁচিশ বছব বযসেব যে সাত আটজন আছে, তাদেব মুখে ? মনটা হুহু কবিতে থাকে। সে একা, তাব কেহ নাই, সকলে তাকে ত্যাগ কবিযাছে। পাওযাব মতো কিছুই সে পায নাই, জীবনে কোনোদিন পাইবে না।

নতুন মাসেব গোডায এমনই বাদলাব দিনে বেতন পাওযা গেল। ছুটিব সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন, ধীবেন আব নিকুঞ্জ তাকে ঘিবিযা ধবিল।

কদ্দিন .দেখা. এ্বে বাখবেন ত্রিষ্টুপবাবু ? আজ আব ছাডছি না। বেশ বাদলাব দিনটা আছে।

চাকবি হওযাব জন্য এবা একদিন খাওযা দাবি কবিযাছিল। ত্রিষ্টুপেব মনে ছিল না।

নিশ্চয। বলুন কী খাবেন ?

চাবজনে সিঁডি বাহিযা নীচে নামিতেছে, অবিনাশ পিছন হইতে ডাকিলেন, ত্রিষ্টুপ ?

ত্রিষ্টুপ কাছে গেল।

টাকাগুলো দিযে যা, আমাব একটু দেবি হবে যেতে।

বাডি গিযে দেব। কজন বন্ধু ধবেছে খাওযাতে হবে।

দুটো টাকা বেখে বাকিটা দিযে যা। অতগুলো টাকা নিযে ঘুবে বেডাবি ? যা অসাবধান তুই ! আব শোন—অবিনাশ গলা নামাইযা ফিসফিস কবিযা বলিলেন, সংক্ষে.. সেবে দিস, অমন বন্ধু ঢেব খেতে চায। একটা চপ কি কাটলেট আব এক কাপ চা – ব্যস ! এক টাক ওই হযে যাবে। তবু দুটো টাকাই ববং বাখ

বাডি গিযে দেবখন !

ত্রিষ্টুপ তবতব কবিযা নামিযা গেল। অবিনাশ আহত বিস্মযেব সঙ্গে ছেলেব দিকে চাহিযা থ বনিযা বহিলেন।

ত্রিষ্টুপ ছাডা তিনজনেই আজ যেন একটু বেশি উত্তেজনাপ্রবণ। নিজেদেব কথা আব হাসি তামাশাব মধ্যেই তিনজনে যেন বসেব অন্ত পাইতেছে না , বিশেষ কবিযা কেবানিবাবুদেব জন্য পবিচালিত এই সস্তা বেস্তোবায চপ-কাটলেট আব চা খাইতে খাইতে জীবনকে উপভোগ কবিতে মশগুল হইযা। ত্রিষ্টুপ কথা বলিল, হাসিতেও যোগ দিল কিন্তু তিনজন ও এক জনেব দুটি দল মিশ খাইতে পাবিল না কোনো বকমেই। এবং ত্রিষ্টুপেব দলে ভেডাব ব্যর্থ চেষ্টায ক্রমে ক্রমে সকলেব উৎফুল্ল ভাবটাও কেমন যেন নিস্তেজ হইযা পডিল।

বাস্তায নামিযা তিনজন কী যেন বলাবলি কবিল নিজেদেব মধ্যে, তাবপব নিকঞ্জ বলিল এ তিষ্টুপবাবু, বলি বাডি যাবেন নাকি এখন ?

কোথা আব যাব বলুন ?

আমাদের সঙ্গে আসুন না, একটু ফুর্তিটুর্তি করা যাক ?

ধীরেন বলিল, মাইনে পাবার পর আমরা একদিন একটু জমাই, তিষ্টুপবাবু।

সত্যেন বলিল, কাল ছুটিও আছে।

ত্রিষ্টুপের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। মানুষের সঙ্গে সে মিশিতে পারে না, সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে ! সঙ্গীহীন অসহায়ের দুর্বোধ্য ভয়টাও পীড়ন করিতেছিল। উগ্র অন্ধ হিংসায় বন্ধু তিনজনকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষার অতি অমায়িক রূপ ও ব্যবহার। ওরা ফুর্তি করিতে চায়—ফুর্তি ! আজ কি তা সম্ভব ? তার পক্ষেও ?

নিকুঞ্জ বলিল, আমরা চাঁদা করে খরচ দি। যা খরচ হয়, চারজনে সমান সমান দেব। আসবেন ?

কত লাগবে ?

গোটা দশেক, আর কত ?

দশ টাকা ! এক সন্ধ্যার ফুর্তির জন্য দশ টাকা খরচ !

কিন্তু ওরা যদি পারে, সে কেন পারিবে না ? হাজার হাজাব টাকা সে একদিন উপার্জন কবিবে, দশ টাকা খরচের নামে তার চমক লাগে ? ধিক !

চলুন যাই।

পরদিন অনেক বেলায় ত্রিষ্টুপের ঘুম ভাঙিল একটা অস্থিরতার মধ্যে। রাত প্রায় একটায় সে বাড়ি ফিরিয়াছিল। বাড়ির সকলে জাগিয়াছিল তার প্রতীক্ষায়। দরজা খোলার পর ভিতবে আলোয় আসিয়া দাঁড়াইলে তার চেহারা দেখিয়া মা চাপা সুরে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, ত্রিষ্টুপের মনে আছে। অবিনাশ কী যেন একটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দাঁড়ায় নাই, কোনো মতে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর এলোমেলো টানে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে দুহাতে চৌকির প্রান্ত চাপিযা ধরিয়া কিছুক্ষণ চিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তারপর এতক্ষণে ঘুম ভাঙিয়াছে।

জলকাদায় পিছল সরু গলিতে ঢোকার পব হইতে শুরু হইয়াছিল তার ফুর্তি—দারুণ ভয, উদ্‌বেগ ও প্রত্যাশার উত্তেজনায়। তারপর এক দেয়ালচাপা বাড়ির দোতলায় ছোটো একটি ঘর—আলো আর ঠাসা আসবাবে সাজানো ঝলমল অদ্ভুত একটি ঘর। আর একটি মেয়ে—ঘরের মতোই যার একটি ছোটো দেহে দশটি দেহের গাদা করা সাজসজ্জা। তারপর নেশা—জীবনে প্রথম মদের নেশা। চাপা কষ্ট আর তীব্র উন্মাদনার অদ্ভুত সমাবেশ—মাটির ভয়ংকর টানে অবলম্বনহীন শূন্যে অবিরাম পড়ার মতো। শেষের দিকে নিকুঞ্জ ধেইধেই নাচিয়া ফুর্তি করিয়াছিল—বেঁটে মোটা, ধীর শান্ত নিকুঞ্জ, অল্পদিন আগে যে বিবাহ করিয়াছে দ্বিতীয়বার। কেমন মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে ? কুন্তলার মতো ?

ঘরের সেই মেয়েটিকেও শেষের দিকে কুন্তলার মতো মনে হইয়াছিল। কতবার সে যে নিজের মাথায় ঝাঁকি দিয়াছে ! কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র, কী বীভৎস একটি রাত তার কাটিয়াছে কাল ; একটু মদ খাওয়া ছাড়া কিছুই সে করে নাই, চুপচাপ বসিয়া শুধু চাহিয়া থাকিয়াছে। তবু তার মনে হইয়াছে, মুহূর্তে মুহূর্তে সে যেন উপার্জন করিতেছে এক অক্ষয় অমর সম্পদ। অভিজ্ঞতা নয়, চেতনার জাগরণ নয়, জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন।

মাথা টনটন করিতেছে, সমস্ত শরীরে জ্বর-ছাড়া বিশ্রী অবসন্নতা বোধ করিতেছে। তবু তার আপশোশ নাই। সে ভুলিতে পারিতেছে না যে রহস্যময় জীবনের একটি ধর্ম সে আবিষ্কার করিয়াছে। মৃতপ্রায় মানুষও বিদ্রোহ করে, করিতে পারে। অবস্থার চাপে, শিক্ষা-দীক্ষা-আবেষ্টনীর চাপে, স্বাস্থ্যহীন

শুষ্ক নীরস একঘেয়ে জীবনের চাপে, মানুষ যত প্রাণহীন নিস্তেজ হোক, বিদ্রোহের প্রেরণা তার মরে না। তার সহকর্মী তিনজন তাই বেতন পাওয়ার পর মাসে একদিন ফুর্তি করে। আর কোনো পথ খুঁজিয়া পায় না, তাই এই ভীরু দুর্বল মানুষ তিনটি এইভাবে বিদ্রোহ করে। একঘেয়ে, নিরুপায়, অবসন্ন জীবনযাপনের বিরুদ্ধে, দিনের পর দিন কলের মতো সুবোধ সুশীল ভালো মানুষ হইয়া থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে !

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ানোমাত্র মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, বইয়ের শেলফটা ধরিয়া ত্রিষ্টুপ ভাবে, তা হোক। এ দুর্বলতা কিছু নয়। মন তার সবল হইয়াছে। আর কোনো দিন সে হতাশ হইবে না। হতাশা বোধ করিলেও আসিয়া যাইবে না কিছুই, সে শুধু হইয়া থাকিবে হৃদয় মনের একটা বদ অভ্যাস। যতদিন সে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে, তার লড়াইয়ের ক্ষমতা আর কিছুতেই নষ্ট হইবে না। নিজের সমস্ত পাওনা আদায় করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো লড়াই কোনো দিন ভালোও লাগিবে না।

নীচে নামিতেই সে সামনে পড়িয়া গেল অবিনাশের। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চাহিয়াই নীরবে তিনি সরিয়া গেলেন।

রাণু জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অসুখ করেছে, মামা ?

প্রভা খোঁটা দিয়া বলিল, তুমিও এমনি করে গোল্লায় যাবে, তা আমি আগেই জানতাম। চাকরি বাকরি করে নিজের ভাগনিকে একটা জামা পর্যন্ত যে কিনে দেয় না, মদ না খেলে সে খাবে কী !

অবিনাশ আড়াল হইতে হুংকার দিয়া উঠিলেন, চুপ কর প্রভা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব। পাড়াসুদ্দু লোককে শুনিয়ে চিল্লাচ্ছেন মেয়ে, বোকা বজ্জাত কোথাকার !

উনানে কেটলি চাপাইয়া মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমে প্রভাকে বলিলেন, জামাই তো চুনকালি দিয়েছে মুখে, ভাইয়ের একদিনের বদখেয়ালটা চেপেই যা না বাছা ? তারপর কাঁদো কাঁদো হইয়া ত্রিষ্টুপকে বলিলেন, না বাবা, তুই লজ্জা করিস নে। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে ওনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি যা। তোর কিছু দোষ ছিল না, পোড়ারমুখো বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে—

অবিনাশ ইতিমধ্যে আড়াল হইতে সামনে আসিয়াছিলেন, বলিলেন, থাক থাক, ও সব কথা বলে আর কী হবে ? টাকা যা আছে, দাও তো তিষ্টু। সব উড়িয়ে দাওনি তো ?

ত্রিষ্টুপ সমস্ত টাকা আনিয়া অবিনাশের হাতে দিল। মোটে গোটা তেরো টাকা কম দেখিয়া অবিনাশ স্বস্তি বোধ করিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া পাঁচটি টাকা ত্রিষ্টুপকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, দরকার হলে চেয়ে নিয়ো।

ত্রিষ্টুপ কিছুই বলিল না।

বেলা তিনটার পর জামাকাপড় পরিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কুন্তলার দিদির বাড়িতে গিয়া সে কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিবে। মনটা কেমন অশান্ত হইয়া আছে, ও বাড়ির শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনী আর দুটি শান্ত ও সুখী মানুষের সঙ্গ হয়তো তার মনটাকেও শান্ত করিয়া দিবে।

বাহিরে যাওয়ার আগে ত্রিষ্টুপ শুনিয়া গেল মা বলিতেছেন, এত বড়ো সোমত্ত রোজগেরে ছেলে, কদ্দিন থেকে বলছি একটা বিয়ে-থা দিয়ে দাও—

আর অবিনাশ বলিতেছেন, মেয়ে তো খুঁজছি—

মেয়ে খুঁজিতেছে, মেয়ে ! তার বাপ তার জন্য মেয়ে খুঁজিতেছে ! এমন হাস্যকর রকমের অশ্লীল ঠেকিল কথাটা ত্রিষ্টুপের কাছে। তার হইয়াছে বয়সকালের রোগ, সে জন্য এই ঔষধ প্রয়োজন। এর বেশি আর কিছু কি ভাবিয়াছে অবিনাশ ? তার মা ? মেয়ে খুঁজিয়া আনিয়া দিলে যথানিয়মেই সে প্রিয়া, সাথি, জননী ও গৃহিণী হইবে, এটা জানা কথা। কিন্তু জানা কথাটাও কি মনে পড়িয়াছে ওদের ? মেয়ে বলিতে যে মানবজাতীয়া জীব বুঝায়, তাও বোধ হয় খেয়ালে আসে নাই।

এই ভাবে কিছু ভাবিতে গেলেই আগে ত্রিষ্টুপ গভীর জ্বালা বোধ করিত, মনে হইত মানুষ বড়ো হীন, জীবনে শুধু ক্লেদ। আজ মৃদু আপশোশের সঙ্গে সে শুধু কৌতুক অনুভব করিল। বাড়িতে নাই বলিয়াই যে বাজারে সে মেয়ে ভাড়া করিয়াছে, এ কথা মনে করার জন্য বাড়ির লোকের উপর রাগ করা চলে না। এ রকম করে বইকী মানুষ, বাড়িতে বউ থাকিলে পর্যন্ত করে, নয়তো ভাড়া করার জন্য এত মেয়ে সংসারে থাকিত না। তাকে মহাপুরুষ মনে করিবার কোনো কারণ বাড়ির লোকের নাই। এটা তার ব্যক্তিগত অপমান নয়। সংসারে এ রকম অনুচিত বাস্তবতা থাকাটা মানুষেরই অপমান। একী ভয়ানক কথা যে যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে মানুষকে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়, ধরিয়া রাখিতে হয় যে, গোল্লায় যাওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক! এই ব্যাপারটাই ত্রিষ্টুপের বড়ো খাপছাড়া মনে হয়। এ রকম অভাব মানুষ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে কেন, মানুষের স্বভাব যাতে বিগড়াইয়া যায়? চরিত্র একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়? তার জন্মের অনেক আগেই এ সব মানুষের ঠিক করিয়া রাখা উচিত ছিল। এতকাল মানুষ তবে কী করিয়াছে?

এটুকু ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে যে এ সব অভাবের ফল, মাসকাবারের পর আপিসের তিন বন্ধুর ফূর্তি করার বিকৃত শখও ওই ধরনের বিকার। কিন্তু তার কতখানি তনুগত আর কতখানি মানসিক অভাববোধের চাপ, ঠিক কী ধরনের সেই অভাব এবং তার কারণ কী, এ সব সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ত্রিষ্টুপ ভাবে, অবসর মতো দু-চারখানা বই পড়িতে হইবে এ বিষয়ে।

মণীশ বলিল, এমন দিশেহারা হলে কিছু হয় না, তিষ্টু।

দিশেহারা?

তা ছাড়া কি? আজ ভাবছ, ব্যাবসা করে বড়োলোক হবে, পরদিন ভাবছ জ্ঞান সঞ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন, আবার শখ চাপছে সমাজের দোষত্রুটি সংশোধন করবে, দেশকে স্বাধীন করবে। একটা মানুষ যদি ব্যবসায়ী, বিদ্বান, সংস্কারক, রাজনৈতিক সব কিছু হতে চায়, তার কিছুই হয় না।

ও রকম বলেছি নাকি?

একদিন এক কথায় বলনি, নানান দিনের নানা কথাবার্তায় বলেছ।

ত্রিষ্টুপ মৃদু হাসিয়া বলিল, ও কিছু নয়। এ কথা সে কথা মনে হয়েছে বলেছি। কাজের বেলায় যা ধরব তাই করব।

কী ধরবে? করবে কি করবে না, পারবে কি পারবে না, সে কথা এখন বাদ দিলাম। কী ধরবে ঠিক করেছ, তাই শুনি আগে?

মণীশের কথায় মৃদু ব্যঙ্গের সুর ত্রিষ্টুপের কাছে ধরা পড়িল। আগেও মণীশ এই সুরে কথা বলিত, সে ভাবিত এটা তার স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গি। সে ছেলেমানুষ বলিয়া মণীশ এ ভাবে তার সঙ্গে কথা কয়। আজ তার মনে হইল, মণীশ এইভাবে তার কাছ হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থন প্রার্থনা করে। আপিসে তার উপরওয়ালা নিরীহ অসহায় ও একান্ত অনুগত তাকে পিঠ চাপড়াইয়া যে ভাবে মিষ্টি সুরে কথা বলেন, তার সঙ্গে মণীশের কথা বলার বিশেষ পার্থক্য নাই।

ত্রিষ্টুপ বিচলিত হইল না। মনের যে পরিবর্তন মণীশের মৃদু তাচ্ছিল্য অনুভব করার ক্ষমতা তাকে আনিয়া দিয়াছে, সেই পরিবর্তনই অনেক কিছু তুচ্ছ করার ক্ষমতাও তাকে দিয়াছে। সে টের পাইয়াছে মণীশের এটা দুর্বলতা।

কী ধরব? আমি যা চাই।

সেটা কী?

আমার যা নেই, সেই সব।

ও তো এক কথাই হল—তোমার যা নেই, তুমি তাই চাও। কিন্তু অভাবের শেষ নেই মানুষের, চাওয়ারও শেষ নেই। দুটো অভাব বেছে না নিলে, তুমি চাইবেই বা কী ? সব অভাব তো মেটে না মানুষের।

মণীশ ফস করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল।

ত্রিষ্টুপ হাত বাড়াইয়া বলিল, আমায় একটা দিন।

সিগারেট দিয়া মণীশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে চাহিয়া থাকে। ত্রিষ্টুপের শান্ত নির্বিকার, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবটা তার কাছে এতক্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলিতেছে এমনিভাবে ত্রিষ্টুপ তারপর বলিতে থাকে, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মণিদা। কিন্তু ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না ঠিক করেছি। ওতে কোনো লাভ হয় না। ও বড়ো গোলমেলে ব্যাপার। ওটা আসলে ভবিষ্যতের হিসাব। কিন্তু একদিন আমি কী চাইব, এখন থেকে সেটা স্থির করে ফেলতে চাই, তাই ধাঁধা লেগে যায়। দশ বছর পরে কী চাইব, আজ কি আমি তা জানি ? কোনো একটা আদর্শ ধরতে পারলেও কথা ছিল। কিন্তু আপনি তো আমাকে জানেন, আদর্শের জন্য বেঁচে থাকার ধাত আমার নয়। আমি তাই ভেবেছি, নিজেকে বাঁধব না। আমি ঠিক করেছি, ভবিষ্যৎকে গড়ে উঠতে দেব। আজ আমার কাছে যা সবচেয়ে দামি, সবচেযে কাম্য, আমি সেটা পাওযাব চেষ্টা করব। সে জন্য যদি ভবিষ্যতের মস্ত কোনো পাওয়া ফসকে যায়, যাবে। বড়ো ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার ভয়ে এতদিন কিছু গ্রহণ করার নামেই আমার আতঙ্ক হয়েছে, যদি বোঝা বেড়ে যায়। এখনও আমি বড়ো হতে চাই, যদিও ঠিক জানি না ভবিষ্যৎটা কী রকম হলে আমি খুশি হব। কিন্তু সব দিক দিয়ে নিজেকে ব্যথিত করার সাধ আমার নেই। এখন থেকেই আমি পাওনা আদায় করতে করতে চলব, মণিদা।

সে তো ভালো কথা ত্রিষ্টুপ।

একটু চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবেই যেন মণীশ কথাটা বলিল। আজ প্রভাতের অভিনব উপলব্ধি এখন কথায় প্রকাশ করিবার সময়ে ত্রিষ্টুপ মণীশের কাছে সমর্থন পাওয়ার কথা ভাবে নাই, নিজের মনেই বলিয়া গিয়াছে। এখন সে উৎসুক দৃষ্টিতে মণীশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জানালা দিয়া ঘরে একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। মণীশ চাহিয়া দেখিতেছে তার সিগারেটের জ্বলন্ত মুখ হইতে নীলাভ ধোঁয়ার আঁকাবাঁকা ঊর্ধ্বগতি। সে যে কী ভাবিতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম, মণিদা।

আমার কাছে ? কী ব্যাপার ত্রিষ্টুপ ?

আমি কুন্তলাকে বিয়ে করতে চাই।

মণীশ এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তা হয় না, তিষ্টু।

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে ত্রিষ্টুপ থতোমতো খাইয়া গেল। অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিল, কেন ?

এতদিন তার জানা ছিল, সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে কি করিবে না, সমস্যা শুধু এই। তার খুশি হইলেই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে পারে, কারও আপত্তি হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই ধারণা লইয়াই সে এতদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে যে এখন বিবাহ করিয়া জড়াইয়া পড়িতে তার কোনো মতেই চলিবে না, তা কুন্তলাই হোক আর যেই হোক। আজ খানিক আগে মনস্থির করিয়া ফেলিবার সময়েও সে ভাবিতে পারে নাই, কেন মণীশ অমত করিবে।

বোনের বিয়ে দেওয়া সম্পর্কে তুমি তো আমার মতামত জানো, ত্রিষ্টুপ। যার সঙ্গে বিয়ে হলে কুন্তলা সুখী হবে, তার সঙ্গেই আমি ওর বিয়ে দেব।

ত্রিষ্টুপের মনে হইল—মণীশ যেন তাকে গাল দিয়াছে। তার সঙ্গে বিবাহ হইলে কুন্তলা সুখী হইবে না। সে যে কুন্তলাকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছে, তাই কি মেয়েটার পরম সৌভাগ্য নয় ? মণীশ কি এমনই মূর্খ যে, এই সহজ কথাটা তার কাছে এখনও ধরা পড়ে নাই, তার সঙ্গে বিবাহ না হইলেই চিরদিনের জন্য কুন্তলা অসুখী হইয়া যাইবে ? তার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে সুখী হওয়ার উপায় এ জীবনে কুন্তলার আর নাই ?

আমার সঙ্গে কুন্তলা সুখী হবে না ?

না ভাই। তোমাদের মিল হবে না। ও তোমার যোগ্য নয়।

মণীশ কি তামাশা করিতেছে তার সঙ্গে ? সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ত্রিষ্টুপ তার মুখ দেখিয়া মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলে, আপনি ওর মত জানেন ?

মত জানি না। মন জানি।

তবে ?

মণীশকে আশ্চর্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারিল, প্রশ্নটা একটু গোঁয়ারের মতোই করা হইয়াছে। এটা ঠিক প্রশ্ন হয় নাই, হইয়াছে কৈফিয়ত তলব। কুন্তলার মনের ভাব কী, সে বিষয়ে যেন কারও কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না ; সুতরাং কুন্তলার মন জানিয়াও মণীশ অমত করিতেছে কেন ? হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের বুকের একটি স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায়। কুন্তলার মনোভাব সম্পর্কে সে এত নিশ্চিত হইল কীসে ? তার জন্য কুন্তলার হয়তো কোনো মাথাব্যথা নাই, সবটা তার নিজেরই কল্পনা ?

কুন্তীর সঙ্গে কি তোমার কোনো কথা হয়েছে, ত্রিষ্টুপ ?

না।

তবে ?

মণীশের পালটা প্রশ্নে ত্রিষ্টুপ একেবারে নিভিয়া গেল, মৃদুস্বরে বলিল, আপনাকেই জিজ্ঞেস করছিলাম।

তা করনি ভাই। তোমার কথা শুনে মনে হল আমার চেয়ে কুন্তীর মন তুমিই ভালো জানো। এ তো ভারী মুশকিলে ফেললে তুমি আমাকে !

আমার তাই মনে হয়। অবশ্য আপনি যদি বলেন—

আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হবে ? আমি হলাম ওর দাদা, গুরুজন। তুমি ভাববে, আমি কিছু জানি না, বুঝি না, কিংবা জানলেও কর্তামি করার জন্য ছেলেমানুষি বলে সব উড়িয়ে দিচ্ছি। তার চেয়ে এক কাজ করি, ওকে ডেকে দি। তুমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ।

ত্রিষ্টুপ অভিভূত হইয়া বলিল, ও ছেলেমানুষ—

তবে ওর মনের কথা তুললে কেন ?

মণীশের কণ্ঠের রুক্ষতায় আহত হইয়া ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

সে জন্য ছেলেমানুষ বলিনি। আমি বলছিলাম, আপনার অমত আছে জেনে ও হয়তো মনের কথা বলতে পারবে না।

মণীশ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, জানো তিষ্টু, তোমার মনের এই জটিলতার জন্যই আমি অমত করছি। সহজভাবে কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমার মত আছে, কি অমত আছে, কুন্তী জানবে কী করে ? আজ এসে তুমি প্রথম কথা তুললে। এ বিষয়ে আমরা কখনও আলোচনা করিনি।

আমি বুঝতে পারিনি মণিদা।

মুশকিল তো হয়েছে সেইখানে। সব কথাই তুমি নিজের মতো করে বুঝে নাও। যেভাবে তুমি নিজে বুঝতে চাও সেই ভাবে।

এ ঠিক মন্তব্য নয়, সমালোচনা। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও কঠোর সমালোচনা স্বীকার করা বা অস্বীকার করার ক্ষমতা ত্রিষ্টুপের ছিল না। নিজের সম্বন্ধে নিজেরই তার কত সংশয় আছে, কত প্রশ্ন আছে। কী করিবে স্থির করিয়া ফেলার সঙ্গে ও সব দ্বিধা সন্দেহের মীমাংসা তো আর হইয়া যায় নাই। কতদিক দিয়া কতভাবে নিজেকে তার আবিষ্কার করিতে হইবে, তাও কি এখনও সে জানে ? তার সম্বন্ধে কেউ জোরের সঙ্গে কোনো মত প্রকাশ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সত্য কি মিথ্যা, ঠিক করিয়া ফেলিবার মতো ভালো করিয়া এখনও সে নিজেকে চেনে না। মণীশের কথায় তার মধ্যে শুধু তীব্র একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, নিজেকে পরাজিত, অক্ষম, অপদার্থ মনে হইতে থাকে। নূতন জীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা শুরু করিয়া গোড়াতেই সে হার মানিল। তার প্রথম চাওয়া, প্রথম দাবি ব্যর্থ হইয়া গেল। অথচ কত সহজ সে ভাবিয়াছিল কুন্তলাকে পাওয়া !

আমি যাই, মণিদা।

পরিচিত ঘরখানা যেন অপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহিরে যাইবে ভাবিয়া সে আগাইয়া যায় দরজার বদলে জানালার দিকে। জানালার কাছে এক মুহূর্ত বিফলের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, যেন ভুলিয়া গিয়াছে এবার সে কী করিবে। তারপর হঠাৎ সচেতন হইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হয়।

তিষ্টু, শোনো।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিতে পায় মণীশ চিন্তিত ভাবে তার দিকে তাকাইয়া আছে।

একটু বোসো, তিষ্টু।

ত্রিষ্টুপ নীরবে বসিয়া পড়িল।

আমি কুন্তীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো, ও যদি রাজি থাকে আমি অমত করব না।

আপনিই বরং জিজ্ঞেস করুন।

মণীশ মৃদু একটু হাসিল। সে ত্রিষ্টুপের ক্ষোভকে পরিণত করিয়া দিল ক্রোধে। খেলা করিতেছে, তার সমস্ত জীবন লইয়া মণীশ খেলা করিতেছে !

না, তোমার জিজ্ঞেস করাই ভালো, তিষ্টু। আমি জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবে আমি জানি। বলবে, আমি কিছু জানি নে দাদা, তোমার যা খুশি কর।

ত্রিষ্টুপ ভাবিল, বটে ! কুন্তলার দাদা-ভক্তি এত গভীর !

তাছাড়া তোমার কথাটাও একটু ভাবতে হবে বইকী। তুমি ইচ্ছে করলে আমি যা বলেছি কুন্তীকে জানিয়ে দিতে পারো, তিষ্টু। ও রাজি হলে আমি অমত করব না।

মণীশ চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই কুন্তলা ঘরে আসিল।

বলুন কী ফরমাশ আছে !

বোসো, কুন্তলা।

কুন্তলা বসিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইল রহিল।

মণিদাকে বলছিলাম, তোমায় আমি বিয়ে করতে চাই।

ও ! বলিয়া কুন্তলা তার মুখ হইতে দৃষ্টিটা শুধু মেঝেতে নামাইয়া লইয়া গেল।

তুমি তো জানো আমি তোমাকে—

দাদা কী বললেন ? ত্রিষ্টুপের প্রেম নিবেদনে বাধা দিয়া কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল।

তোমার মত জানতে বললেন।

ত্রিষ্টুপ জবাবের প্রতীক্ষা করে। কুন্তলা চুপ করিয়া থাকে।

মণিদা বললেন, তুমি রাজি থাকলে তিনি মত দেবেন।

আমি কিছু জানি নে।

তুমি রাজি আছ তো ?

দাদা যা বলবেন।

ত্রিষ্টুপ কথা খুঁজিয়া পায় না। কুন্তলাকে তার খাপছাড়া, অদ্ভুত মনে হয়। চোখটি শুধু সে নত করিয়া রাখিয়াছে, কোনো উত্তেজনার চিহ্নই তার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কথা বলিতে গলাটি পর্যন্ত তার একটু কাঁপিয়া যাইতেছে না। অতি তুচ্ছ সাধারণ কথা যেন তারা আলোচনা করিতেছে।

তোমার ইচ্ছেটা আমায বলো। তারপর মণিদাকে জানাব।

আমার কোনো ইচ্ছে নেই।

তোমার ইচ্ছে নেই !

কুন্তলা চোখ তুলিয়া তার মুখে দৃষ্টি বুলাইয়া দেওয়ালেব দিকে চাহিল।

তা নয। দাদা যা বলবেন তাই হবে। আমায কেন জিজ্ঞেস করছেন ? আমি কিছু জানিনে।

তুমি এ কী কথা বলছ কুন্তলা ?

কেন ?

মণিদা কি তোমার ভালো-লাগা না-লাগা ঠিক কবে দেন ? তোমাব নিজের শখ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই ? পছন্দ নেই ?

তা কেন থাকবে না ?

আমাকে তুমি পছন্দ কর ?

এ পছন্দের কথা নয়।

ভালোবাস ?

তা জানি না।

খানিক আগে ঘরটা যেমন অপরিচিত ঠেকিয়াছিল, কুন্তলাকে এখন ত্রিষ্টুপেব তেমনই অপরিচিত অজানা অচেনা মনে হইতে লাগিল। কুন্তলা যে কোনোদিন তাব কাছে এত সহজে বিনা চেষ্টায় এমন একটা ধাঁধা হইযা উঠিতে পাবে, ত্রিষ্টুপ কোনোদিন কল্পনাও কবিতে পাবে নাই।

আমার সঙ্গে বিযে হলে তুমি খুশি হবে ?

জানি না।

তুমি তবে বাজি নও ?

আমি রাজিও নই, অরাজিও নই। কেন এ সব জিজ্ঞেস করছেন আমাকে ? যা বলবাব দাদাকে বলুন।

এ জবাবের পর আর কোনো কথা চলে না। আর কিছু বলার সুযোগও কুন্তলা তাকে দিল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ত্রিষ্টুপ চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। কী জানা গেল এতক্ষণ জেরা করিয়া ? কিছুই নয় ? তার সম্বন্ধে কুন্তলার অনুরাগ বা বিরাগ নাই, অন্তত আছে কি নাই, কুন্তলা নিজে সে হিসাব রাখে না, এটা অবশ্য জানা গিয়াছে। কিন্তু ও জানা জানাই নয়। একটা অস্পষ্ট অনুভূতি ত্রিষ্টুপকে পীড়া দিতে লাগিল, সে যেন কী একটা ছেলেমানুষি করিয়াছে—কুন্তলার কাছে করিয়াছে ! তার নিজের স্বপ্নকে বাস্তব প্রমাণ করার জন্য শিশুর সঙ্গে তর্ক করার মতো ছেলেমানুষি।

মণীশ আসিলে সে ঝাঁঝালো গলায় বলিল, মণিদা, এমনি করে আপনি বোনদের মানুষ করেছেন ?

কেমন করে তিষ্টু ?

চারিদিক থেকে মনের আঁটঘাট বেঁধে রেখে ? আপনি বলে দিলে তবে কুন্তলা বুঝতে পারে ওর কী ভালো লাগে, কী ভালো লাগে না !

মণীশ মৃদু হাসিল।—তুমি ভুল করছ তিষ্টু। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছ না। কুন্তলার মন স্বাধীন ভাবেই গড়ে উঠেছে। আমি শুধু ওর মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি হতে দিইনি। ওকে নিয়ে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া চলছে, ও তা ধারণাও করতে পারবে না।

ত্রিষ্টুপ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণিদা। আমি কুন্তলাকে বিয়ে করব।

বলিয়া মণীশকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

ত্রিষ্টুপের মনে হইল, আবার তার চিন্তাজগতে একটা ওলট পালট ঘটিবাব উপক্রম হইয়াছে, বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন রাত্রে হইচই করার পর যেমন হইয়াছিল। মনের অনেকটা আশ্রয় তার ভাঙিয়া গিয়াছে। বড়ো একটা ভুল ধরা পড়ার সঙ্গে নতুন দৃষ্টির আলোয় আরও কত ছোটো ভুল যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তার সংখ্যা হয় না। অনেক ধারণা তাকে বদল করিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে ; নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্য যাচাই করিবার জন্য শিখিতে হইবে নূতন হিসাবশাস্ত্র।

সবচেয়ে ভয়ানক কথা, এবারের ধাক্কায় তার আত্মবিশ্বাস যেন একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

মনে হইতেছে, এ আত্মবিশ্বাসের মূল্য কী যা নিজের ভুল ধারণাকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়, যা অন্ধ একগুঁয়েমির শামিল ?

কয়েকদিন মনের এলোমেলো গতির কোনো হদিস ত্রিষ্টুপ পায় না। কখনও নিজেকে অকথ্য রকমের বিব্রত ও বিপন্ন মনে হয়, কখনও রাগে গা জ্বালা করিতে থাকে, কখনও হৃদয়ের সমস্ত চাপল্য ডুবিয়া যায় গভীর উদাস ভাবের থমথমে ব্যথিত শান্তিতে।

অথচ নিজের মধ্যে যে পরিবর্তনের জন্য সে অপেক্ষা কবিয়া থাকে, সে পরিবর্তন আর আসে না। ভিতরে কেবল তোলপাড়ই চলিতে থাকে। আগের বার পরিবর্তন আসিয়াছিল স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত, কী করিবে, কোন পথে চলিবে নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কী করিবে জানা থাকিলেও, এবার যেন কোনো মতেই খেয়াল হইতেছে না কোন পথে চলা দরকার। দিশেহারা ভাবটা কোনো মতেই কাটিতেছে না।

কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে।

এটা তার করা চাই। মণীশের মত না থাক, কুন্তলা তাকে পছন্দ না করুক, কুন্তলাকে সে বিবাহ করিবে। এটা জিদের কথা নয়, গোয়ার্তুমি নয়। এই তার সংকল্প। প্রেম চুলোয় যাক, সুখের নীড়ের স্বপ্ন আকাশে থাক। সে পুরুষ, সে কুন্তলাকে চায়। তাই সে কুন্তলাকে বিবাহ করিবে। কুন্তলা তার কাম্য এবং প্রাপ্য—ওকে সে আদায় করিবে। যে ভাবেই হোক।

এ পর্যন্ত কোনো গোলমাল নাই। প্রশ্ন শুধু এই—কী ভাবে ? নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব তার জোটে না।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাবার প্রক্রিয়া এখনও না জানায় ত্রিষ্টুপ বড়ো মুশকিলে পড়িয়াছে।

মা বলেন, তুই কিছু মনে করিসনে বাবা।

ত্রিষ্টুপ চমকাইয়া ওঠে, কী বলছ তুমি ?

বলছি কী, ওঁর নানারকম বাতিক। উনি কী বলেন, করেন তাতে তুই রাগ করিসনে বাবা।

ও, এই কথা।

ত্রিষ্টুপ স্বস্তি বোধ করে। প্রথমে তার মনে হইয়াছিল মণীশদের বাড়ি হইতে খবরটা বুঝি এ বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং মা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বলিতে আসিয়াছেন, তুই ভাবিসনে বাবা, কুন্তলার চেয়ে লক্ষগুণে সুন্দরী লেখাপড়া গানবাজনা জানা বউ তোর জন্য এনে দেব !

একবার এক মুহূর্তের জন্য ত্রিষ্টুপের মনে হইল, মাকে বলিলে কেমন হয় ? মার কাছে তার মনের কথা জানিয়া বাবা যদি মণীশের কাছে নূতন করিয়া বাঙালি প্রথায় আবার প্রস্তাবটা উত্থাপন করেন, কোনো ফল হওয়ার আশা আছে কি ?

তারপর মণীশের কথা ভাবিয়া ত্রিষ্টুপের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। অত সহজে মণীশের মত বদলায় না। মণীশ শান্ত কিন্তু বড়ো শক্ত। না ভাঙিয়া ওকে মচকানো যাইবে কিনা সন্দেহ। তার চেয়ে বরং রমলার সঙ্গে পরামর্শ করিলে কাজ দিতে পারে।

বিকালে ত্রিষ্টুপ রমলাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য বাহির হইয়াছে, পথের মোড়ে মণীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হঠাৎ কী যে খেয়াল চাপিল ত্রিষ্টুপের !

মণিদা ?

কী খবর তিষ্টু।

কেমন একটু লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ হইতেছে, মুখ তুলিয়া মণীশের চোখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ত্রিষ্টুপ আশ্চর্য হইয়া গেল, তারও লজ্জা-সংকোচ আছে !

মা বলছিলেন, কুন্তলাকে একবার দেখতে চান। পাঠিয়ে দেবেন ?

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

তুমি কি মাকে বলেছ ?

না।

তবে হঠাৎ— ?

কুন্তলার কথা মাঝে মাঝে মাকে বলতাম—এমনি কথায় কথায়। সেই জন্য হয়তো দেখতে ইচ্ছে হয়েছে মেয়েটি কেমন। গায়ের জোরে মুখ তুলিয়া ত্রিষ্টুপ সোজা মণীশের চোখের দিকে তাকায়, হয়তো অন্য কথাও ভাবছেন, বলতে পারি না।

আচ্ছা কুন্তলাকে বলব।

আমার কোনো মতলব নেই মণিদা।

তোমার কী মতলব থাকবে।

আপনি যদি কিছু ভাবেন, আপনার যদি ভয় হয় তাই বলছিলাম।

মণীশ শান্তভাবে সহানুভূতির সঙ্গে বলিল, এখনও তোমার মন শান্ত হয়নি তিষ্টু ? এ তো ভারী দুঃখের কথা হল।

ত্রিষ্টুপ প্রাণপণ চেষ্টায় একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। না না, ভাববেন না। ও সব কিছু নয়।

রমলাদের বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত পথ ত্রিষ্টুপ শুধু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া গেল। হঠাৎ এই পাগলামি করার মানে কী ? মণীশকে মিথ্যা বলিয়া কুন্তলাকে দু-একবার বাড়িতে বেড়াইতে আনিয়া তার লাভ কী ?

নিজের মনের কথাটা নিজের কাছেই ত্রিষ্টুপের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, আর কিছু নয়, মাঝে মাঝে বাড়িতে আনিয়া কুন্তলাকে বশ করিবে। যেন সুযোগ পাইলেই মেয়েদের বশ করা যায়, দিনের পর দিন বাহুবন্ধনে পাইয়াও কত স্বামী যে স্ত্রীর মনটা পায় নাই !

তারপর চিন্তাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ও রকম বশ করিয়া কি কোনো লাভ হইবে মণীশের বোনকে ? বশীকরণ সম্পূর্ণ হওয়াব পরেও কি মণীশের বোন বলিবে না : আমি কিছু জানিনে, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন ? কুন্তলা যে এখন তাকে ভালোবাসে না তাই বা কে বলিল ! ভালোবাসিয়াও হয়তো সে বলিয়াছে, দাদার কথাতেই তার মরণ-বাঁচন, তার নিজের কোনো পৃথক ইচ্ছা নাই।

মণীশকে ত্রিষ্টুপের রূপকথার দানবের মতো মনে হয—তার রাজকন্যাকে সে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। এমন ঘুম পাড়াইয়াছে যে, রাজপুত্র আসিযা জাগাইলেও, সে জাগে না—জাগিয়াও তন্দ্রার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু কুন্তলাকে জাগানো চাই, মণীশের মন্ত্রের প্রভাব ব্যর্থ করা চাই।

যদি চাই—তবে দোষ কী ? কী দোষ এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে, যখন তাকে বিবাহ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না, তার সঙ্গে কুন্তলার বিবাহ দেওযা ছাড়া মণীশেব কোনো উপায় থাকিবে না ?

ভাবিলেও ত্রিষ্টুপের মাথা ঝিমঝিম করে, গলা শুকাইয়া যায। দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সে নির্জন ঘরে, জরাজীর্ণ ট্রামে-বাসে নিজেব সঙ্গে লড়াই কবে। না, এতে কোনো দোষ নাই। তার উদ্দেশ্য তো খারাপ নয়, সে তো বিবাহ কবিবে কুন্তলাকে। আব কোনো উপায যখন নাই, এ উপায়টি বর্জন কবা কাপুরুষতা।

শিশির নামে ত্রিষ্টুপের একজন বন্ধু ছিল, পাড়াতেই বাড়ি। বাড়ির সকলে দেশে গিয়াছে, বাড়িটা খালি। শিশির কেবল বাড়িতে থাকে, খায মেসে।

শিশিরের আপিস যাওয়াব সময়ে ত্রিষ্টুপ একদিন সদরেব তালার চাবিটা চাহিযা রাখিল।

কেন ?

কাজ আছে।

আচ্ছা ? শিশির হাসিতে হাসিতে আপিস চলিযা গেল।

দুপুরবেলা ত্রিষ্টুপ গেল মণীশদের বাড়ি। মণীশও বাহিরে যাইতেছিল, ত্রিষ্টুপের মুখ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা কবিল, তোমার জ্বর হযেছে নাকি তিষ্টু ?

ত্রিষ্টুপ হাসিবার চেষ্টা কবিয়া বলিল, না—সাবান দিয়েছি, তাই চুল উশকো-খুশকো দেখাচ্ছে।

চুল তোমার বেশ চকচক করছে, টেরি ভাঙেনি। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে তুমি বড়ো অভিমানী, বড়ো একগুঁয়ে, না ?

ছিলাম একটু এখন ভালো ছেলে হয়ে গেছি। কুন্তলাকে নিযে যেতে এসেছি মণিদা।

মণীশ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে। প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতেই সে ত্রিষ্টুপেব মুখেব দিকে চাহিয়া থাকে, কিন্তু চোখে তার একটু সময়ের জন্য কঠিন প্রশ্ন উঁকি দিয়া যায়।

নিয়ে যাও।

ডাকিলেই কুন্তলা আসিল। তাকে দেখিয়াই ত্রিষ্টুপের মুখ যে একেবারে বিমর্ষ পাংশু হইয়া গেল, কেহ লক্ষ করিল কিনা, জানা গেল না।

তিষ্টু তোমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে কুন্তী।

এখন ?

তাই তো বলছে তিষ্টু।

যাব ?

কুন্তলার এই একটি প্রশ্নে, মণীশের কাছে অনুমতি চাওয়ায়, ত্রিষ্টুপের বিবর্ণ মুখ চোখের পলকে রাঙা হইয়া গেল। কুন্তলার প্রশ্নের জবাব না দিয়া, মণীশ তার মুখেব দিকে চাহিয়া আছে খেয়াল করিয়া, জোরে সে নীচের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল।

মণীশ তখন বলিল, যা।

কুন্তলা বলিল, চলুন যাই।

ত্রিষ্টুপ বলিল, রিকশা ডাকি ?

রিকশা কী হবে ?

কাপড় বদলে এসো তবে। আমি বসছি।

কাপড় বদলাতে হবে না। চলুন।

মণীশ বাহিরে যাইতেছে, সে যদি তাদের সঙ্গ নেয় ? মণীশ চলিয়া যাওয়াব খানিক পরে তাদের বাহির হওয়া দরকার।

এক গ্লাস জল দেবে কুন্তী ?

দিই। কুন্তলা জল আনিতে গেল।

মণিদা, আমি একটু বিশ্রাম করে—

মুখ ফিরাইয়া ত্রিষ্টুপ দেখিল—মণীশ কখন বাহির হইয়া গিয়াছে, সে টেরও পায় নাই।

শিশিরদের বাড়ির সদর দরজায় ত্রিষ্টুপ তালা দিয়া যায় নাই, দরজা খোলাই ছিল। কুন্তলা ভিতরে গেলে ত্রিষ্টুপ দরজা বন্ধ করিল। কুন্তলা এ-কথা সে-কথা বলিতেছিল, তার যেন মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে সায় দিতে গিয়াও ত্রিষ্টুপের গলায আটকাইয়া যাইতেছিল। সব কেমন অবাস্তব, স্বপ্নের মতো মনে হইতেছে, অথচ বাস্তবতার অনুভূতির চাপে প্রাণটা তার হাঁসফাঁস করিতেছে। নিজেকে কত বার এই পরিস্থিতিতে ধীর স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠ বীরের মতো সে কল্পনা কবিয়াছে, কুন্তলাব কাল্পনিক আর্তনাদে পর্যন্ত সে বিচলিত হয় নাই, সংকল্পে অটল থাকিযাছে। কুন্তলাকে সঙ্গে কবিযা বাড়িতে ঢুকিবার আগে হইতেই যে তার হৃদয-মন এমন অবাধ্যপনা আবম্ভ কবিবে, কে জানিত !

উপরে শিশিরের দাদার শোবার ঘবে সে কুন্তলাকে লইযা গেল। ঘবে বসিবার ব্যবস্থাও ছিল, খাটে বিছানাও পাতা ছিল। পাশাপাশি বালিশ পাতা নবপরিণীত স্বামী-স্ত্রীর সেই শয্যার দিকে চাহিযা ত্রিষ্টুপ যেন চমকিয়া গেল। কুন্তলার পিছু পিছু সবে সে ঘরেব ভিতরে পা দিযাছিল, হঠাৎ নিঃশব্দে বাহির হইয়া বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুন্তলা ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিযা রহিল। ত্রিষ্টুপকে ডাকিল না, কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না।

কুন্তলার এই নীরবতাই শেষ পর্যন্ত ত্রিষ্টুপকে ভিতবে টানিয়া আনিল।

এটা আমাদের বাড়ি নয় কুন্তী।

জানি।

কুন্তলা আবার বলিল, আপনাদের বাড়ি আমি চিনি।

তবে এলে কেন ?

দাদা আসতে বললেন।

ত্রিষ্টুপ একটা চেয়ার টানিয়া কুন্তলার মুখোমুখি বসিল।

এ বাড়িতে কেউ নেই জানো ?

জানি।

তবে যে এলে ?

বললাম তো দাদা আসতে বললেন।

ত্রিষ্টুপ এবার চটিয়া গেল। দাদা ! দাদা ! দাদা ! তোমার মতো এমন দাদাভক্ত কখনও দেখিনি কুন্তী।

কুন্তলা একটু হাসিল।

ত্রিষ্টুপ আরও চটিয়া গেল।—তোমায় এখানে কেন এনেছি জানো ? বিয়ে কবব বলে। দরকার হলে জোর করে বিয়ে করব বলে। বুঝতে পারছ সেটা কী ?

কুন্তলা মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, দাদা বলছিল, আপনি ভয়ানক একগুঁয়ে।

ত্রিষ্টুপ ক্লিষ্ট জ্বালাভরা হাসি হাসিল।—একগুঁয়ে ? তোমার দাদা তাই জানে। একগুঁয়ে হলে, এত করে তোমাকে এখানে এনে মত বদলাতাম না কুন্তী। আমার এতটুকু মনের জোর নেই। তোমাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।

ছেড়ে না দিলে কী হত ?

আমাকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার কোনো উপায় থাকত না। মণিদাকেও বাধ্য হয়ে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে হত।

কুন্তলা মুখ নিচু করিযা মৃদুস্বরে বলিল, আপনি দাদাকে জানেন না। ত্রিষ্টুপ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বল কী ! আজ আমাদের আসল বিয়েটা হয়ে গেলেও, তোমার দাদা সামাজিক বিয়ে দিতেন না ? বেশ, বেশ ! তারপর তোমার দাদার পছন্দমতো বরের সঙ্গেই বিয়ের আয়োজন হলে, তুমিও বোধ হয় দাদার আজ্ঞা মাথায় করে রাজি হয়ে যেতে ?

দাদা আপনাকে চেনেন, তাই আমাকে আসতে দিয়েছেন। দেখছেন তো দাদার ভুল হয়নি ?

ত্রিষ্টুপের সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া মণীশের বিরুদ্ধে একটা দুঃসহ ক্রোধে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কুন্তলাব কথায তার মাথা খারাপ হইয়া গেল।

ভুল হযনি ? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি ভুল হয়েছে কিনা !

কুন্তলার হাত ধরিযা সে হিড়হিড় কবিয়া বিছানার কাছে টানিয়া লইয়া গেল। নিজে বসিয়া দুহাতে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সে অনুভব করিল, কুন্তলার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ঢিপঢিপ করিতেছে। এতক্ষণ পরে কুন্তলার মুখ একটু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তার চোখে দেখা দিয়াছে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

ভুল হয়নি মণিদার ?

না।

কুন্তলার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে ত্রিষ্টুপের হাতেব বন্ধন আলগা হইযা আসিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিলেই সরিয়া যাইতে পারিত ; কিন্তু ত্রিষ্টুপ সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত সে নড়িল না।

আমি হার মানলাম কুন্তী, মণিদার ভুল হয়নি।

সংস্কাব কি এত সহজে জয করা যায় ?

সংস্কার নাকি ?

অসহায়ের ওপর দরদ আপনাব রক্তে মিশে আছে।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিল।

চলো তোমায় দিয়ে আসি কুন্তী !

চলুন।

কিন্তু কেউ উঠিল না, দুজনেই যেমন বসিযাছিল তেমনই বসিয়া র'ইল। ত্রিষ্টুপ সহজ সুবে বলিল, আমাকে ক্ষমা করো। জীবনে অনেক কিছু আদায় করব ছকেছিলাম, তার মধ্যে প্রথম ছিলে তুমি। প্রথমটাতেই ব্যর্থ হব ?—ভাবলেই মনে হচ্ছিল সমস্ত জীবনটাই তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোনো উপায় ছিল না, তাই এই খাপছাড়া উপায়টা দিয়ে চরম চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। অন্য উপায় থাকলে—

অন্য উপায় তো ছিল !

ছিল কী উপায় ?

আদায়ের যে ছক করেছিলেন সে বদলে ফেলা।

তাতে কী হত ?

দাদা রাজি হতেন। আপনি ঠিক করেছেন বড়ো হবেন। টাকা-পয়সা, মানসম্ভ্রম, এ সব নিয়ে যারা বড়ো হয়, দাদার কাছে তাদের কোনো দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা ধরবেন তা ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে খ্যাতি লাভ করবেন—এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনও বিয়ে হয় ?

কেন ?

আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি—জীবন দিয়ে কী আদায় করব।

কী আদায় করবে ?

স্বাধীনতা।

ত্রিষ্টুপ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, ও !

কুন্তলা ব্যগ্রভাবে বলিল, বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব ? আপনি যা চান, সে সব আদায় যারা আদায় করেছে, তারা হল এক জাত ; আর তাদেব পায়ের নীচে যারা চ্যাপটা হয়ে মরছে, তারা হল আর জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনও বোনকে দিতে পারে ?

কেরানিরা তো তোমাদের স্বজাত ? তোমার দিদিকে তো কেরানির হাতে দেওয়া হয়েছে। আমিও কেরানি।

কুন্তলা আঁচল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর হাসিল,—কেরানির কোনো জাত নেই। জামাইবাবু আমাদের জাতের লোক, পেটের জন্য কেরানিগিরি করছেন। জামাইবাবু দু বছর পবে এই সেদিন ফিরেছেন, জানেন না ?

ত্রিষ্টুপ জানিত না। কীই বা সে জানিত ? আশি টাকার কেরানি ও রমলার ঘবে আনন্দের ছড়াছড়ি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। মণীশকে সে ভাবিয়াছিল খাপছাড়া রহস্যময় মানুষ ' কুন্তলাকে সে ধরিয়া রাখিয়াছিল আত্মচেতনাহীন সৃষ্টিছাড়া পরবশ মেয়ে ' জীবনাদর্শ কত সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এ সবের ! ত্রিষ্টুপ খাট ছাড়িয়া কুন্তলার কাছে গিয়া বসিল।

তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কুন্তী। আমার প্রথম আদায় ফসকে গেল, ছকটাও ওলট পালট হয়ে গেল। আমি যদি নতুন ছক কাটি, যদি তোমাদের জাতে উঠতে চাই। মণিদা রাজি হবেন ?

নিশ্চয়। কিন্তু মত বদলানো বড়ো কঠিন।

সে আমি বুঝব। তুমি রাজি হবে ?

দাদা রাজি হলে—

ত্রিষ্টুপ অসহিষ্ণুর মতো বাধা দিয়া বলিল, তোমার নিজের কথা বলো। মনে কবো তোমাব আর আমার জীবনের আদর্শের একচুল তফাত রইল না। তখন যদি মণিদাকে বলার আগে তোমাকে বলি, মণিদাকে জিজ্ঞেস না করেই তুমি তোমার মত জানাবে ?

কুন্তলা বলিতে গেল, ও সব যদি-টদির কথা—

ত্রিষ্টুপ প্রায় ধমক দিয়া বলিল, যদির কথাই বলো। রাজি হবে ?

হব।